ভারতী ও সমরেশ দাশগুপ্তকে

R. K.

# কষ্ট

মাঝে মাঝে আমি একটা দ্বীপের স্বপ্ন দেখি।

শুধু রাত্রে ঘুমের ঘোরেই নয়, মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও কোথাও একলা চুপ করে বসে থাকলে সেই দ্বীপটার ছবি দেখতে পাই।

দ্বীপটি সমতল এবং খুব বড়ো নয়। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে যেতে খুব বেশি সময় লাগে না। চারপাশে সমুদ্র।

দ্বীপটিতে অসংখ্য ফড়িং। এতো ফড়িং ওখানে এলো কোথা থেকে কে জানে। মনে হয়, কোনোদিন বোধ হয় এক জোড়া ফড়িং ওখানে কোনোক্রমে গিয়ে পড়েছিলো, হয়তো কোনো জাহাজে। তারপর তারা বংশবৃদ্ধি করে এক রাশ হয়েছে—কিন্তু দ্বীপ ছেড়ে আর কোথাও যাবার উপায় নেই।

দ্বীপে গাছ আছে অবশ্য। তবে অধিকাংশ গাছই ছোট ছোট। মাঝে মাঝে দু-একটা লম্বা দেবদারু। এক জায়গায় একটা সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেত। বাগান না বলে ক্ষেত বললাম এই জন্য যে, ওখানে আর ফুলের বাগান কে বানাবে!

দ্বীপে মানুষ আছে তিনজন, কিন্তু তাদের বাগান করার ব্যাপারে একেবারেই মন নেই। তারা দিন রাত ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করে, তাদের মাথার ওপর সব সময় ভনভন করে ফড়িং—ওরা বিরক্ত হয়ে ফড়িং তাড়ায়। দ্বীপটাতে কিছু খরগোসও আছে বলে মনে হয়। কারণ, আমি মাঝে মাঝে ঐ তিনজনকে মাংস ঝলসে খেতে দেখেছি।

ওরা থাকে একটা পাতার বাড়িতে। গাছের ডালপালা আর পাতা দিয়ে ওরা নিজেরাই বানিয়েছে। দুজন পুরুষ ও একজন নারী। ওরা কোথা থেকে এসেছে আমি জানি না—অথচ মুখগুলো চেনা চেনা মনে হয়।

ওদের তিনজনেরই বয়স আমারই বয়েসের কাছাকাছি। মেয়েটিও ছেলে দুটির মতো প্যান্ট পরে থাকে। তার মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, সে খোঁপা বাঁধে না, একটা সোনালী লতা গিঁট বেঁধে রাখে।

মাঝে মাঝে ওদের কথাও আমি শুনতে পাই। একটি ছেলে বললো, আজ কোন দিকে যাবো?

আর একটি ছেলে বললো, চলো উত্তর দিকে।

মেয়েটি বললো, না দক্ষিণ।

দ্বিতীয় ছেলেটি জোর দিয়ে বললো, উত্তর।

মেয়েটিও জোর দিয়ে বলে, না দক্ষিণ।

প্রথম ছেলেটি বললো, ঠিক আছে, ঠিক আছে—আমরা বরং তিনজনে তিন দিকে যাই। একটু বাদে আবার সবাই এখানে ফিরে আসবো।

মেয়েটি বললো, কিন্তু তা হলে যে আর একটা দিক বাকি থাকবে?

প্রথম ছেলেটি বললো, সে আর কি করা যাবে!

মেয়েটি বললো, ধুৎ, ভালো লাগে না। আর একজন থাকলে বেশ হতো।

তখন মেয়েটি উদাসীনভাবে আকাশের দিকে তাকায়। তার চুলে এক হাত, এক হাত সামনের দিকে। ঠিক তাকে একটা ছবির মতন মনে হয়। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে হরিণীর মতো ছুটে যায়—ছেলে দুটি বলে, দাঁড়াও, দাঁড়াও। তারপর তারাও দৌড়োয়।

প্রায়ই দেখতে পাই, ওদের নানান খেলায় একজন লোক কম পড়ছে। সময় কাটাবার জন্য ওদের খেলা করতেই হবে—কিন্তু আর একজনের অভাবে কোনো খেলাই ঠিক জমে না। মেয়েটি অভিমান প্রকাশ করে।

এই দ্বীপের স্বপ্নটা আমার খুব প্রিয় স্বপ্ন। মাঝখানে দু-তিন দিন স্বপ্নটা না দেখলে আমি একটু অধৈর্য হয়ে পড়ি। অথচ, স্বপ্ন তো জোর করে দেখা যায় না! যে সব দিন আমাকে বিরক্তিকর অপমানজক

কাজের মধ্যে কাটাতে হয়, সেইসব দিন স্বপ্নটা আসে না।

তবে, স্বপ্নটা আমি যতোবার দেখি, কখনো পুরনো হয় না। প্রত্যেকবারই দৃশ্যগুলো আলাদা। কোনোদিন দেখি, ফড়িংয়ের ঝাঁক ঝাঁপিয়ে পড়েছে সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেতে, ছেলেমেয়ে তিনটি ঘুমিয়ে আছে দেবদারু গাছের নীচে। কখনো দেখি ওরা সমুদ্রে নেমে মাছ ধরায় মত্ত। কখনো ওরা রাত্রিবেলায় আগুন জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসে অতীতকালের গল্প বলে। কোনো দুঃখের সুর নেই। গল্প বলতে বলতে একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে, মনে আছে? মনে আছে? মেয়েটি সব সময় বলে, আমার সব মনে থাকে।

একদিন মেয়েটি হঠাৎ চমকে উঠে বললো, আমাদের কে যেন দেখছে!

প্রথম ছেলেটি তাড়াতাড়ি চারপাশে তাকিয়ে বললো, এখানে কে আবার দেখবে?

দ্বিতীয় ছেলেটি বলে, ফড়িংরা দেখছে সব সময়।

মেয়েটি বলে, ওরা নয়। মানুষ।

প্রথম ছেলেটি বললো, এখানে আবার মানুষ কোথা থেকে আসবে?

মেয়েটি তবু বললো, তা জানি না। কিন্তু আমি একজন মানুষের চোখ টের পাচ্ছি।

দ্বিতীয় ছেলেটি বললো, মেয়েরা পেছন থেকেও মানুষের দৃষ্টি টের পায়। সুতরাং—

ওরা তিনজনেই তখন মুখ ঘুরিয়ে তাকালো। স্বপ্নের মধ্যে সোজা চোখাচোখি হয়ে গেলো আমার সঙ্গে। আমি চমকে উঠলাম।

ওরা তিনজনে তখন একসঙ্গে হাতছানি দিয়ে আমাকে ডেকে বললো, এসো, এসো—

ওদের মুখে হাসি ছড়ানো। যেন ওরা চতুর্থ ব্যক্তিটিকে খুঁজে পেয়েছে। ডাকতে লাগলো, এসো, এসো—

আমি দু হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেললাম। আমার বুকের মধ্যে

এমন কষ্ট হতে লাগলো যেন আমার ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠাই ভালো। অথচ কান্না আসে না। ঐ দ্বীপে কি করে যেতে হয় আমি তো জানি না। আমি যেন এক বাস্তব জগতে বন্দী।

কলকাতা শহরে কতো লোক আমাকে চেনে—আমি যখন পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াই, লোকজনের সঙ্গে কথা বলি—তখন কি কেউ বুঝতে পারে, আমার বুকের মধ্যে সব সময় রয়েছে ঐ দ্বীপে পৌঁছোতে না পারার কষ্ট ?

## পুরনো আমি

কলেজ স্ট্রীটে হঠাৎ দেখা কমলেশের সঙ্গে। কলেজ ছাড়ার পর অনেক দিন ছিল দিল্লীতে, সদ্য কলকাতায় এসেছে বদলি হয়ে এবং বিয়ে করেছে। আমার হাত ধরে টেনে বললো, চল আমার বাড়িতে।

ট্যাক্সি দাঁড় করানোই ছিল, কমলেশ কিনতে এসেছিল একটা দরকারী বই ; সেই ট্যাক্সিতে উঠলাম। তখনো জানি না কমলেশের নতুন বাড়িটা কোথায়। তার পর দুজনে গল্পে গল্পে মগ্ন হয়ে গেছি, আমি কিছু খেয়ালই করিনি। হরীশ মুখার্জী রোডে এক জায়গায় ট্যাক্সি থামলো, ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে কমলেশ একটা বাড়ির দরজার কাছে এসে বললো, আয় ! আমি থমকে গেলাম।

এই বাড়ি ?

কমলেশ জিজ্ঞেস করলো, কেন, এ বাড়ির কারুকে তুই চিনিস নাকি ?

উত্তর না দিয়ে আমি হাসলাম।

এ বাড়ির সব কিছু আমার মুখস্থ। লোহার গেট খুলে প্রথমেই একটা উঠোন। তারপর সামনে একটা ফ্ল্যাটের দরজা। বাঁ দিক দিয়ে সিঁড়ি। দোতলায় একটা ছোট ছাদ আছে। তিনতলার ছাদটা বেশ বড়। সেখানে শুধু রয়েছে একটা চিলেকোঠা। যত রাজ্যের ভাঙা দরজা-

জানলা আর কাঠের সিন্দুকে ঘরটা ভর্তি।

এক সময়, টানা সাত বছর আমরা এই বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, আমার কৈশোর কেটেছে এখানে।

কমলেশ বললো, কি রে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? আয়।

আমি ওর সঙ্গে লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। উঠোনের একপাশে আমরা গর্ত করে গাব্বু বসিয়েছিলাম। ওখানে আমাদের গুলি খেলা চলতো। গাব্বুটা নেই। নতুন করে সিমেন্ট করা হয়েছে উঠোনে। এখন এ বাড়ির কোনো ছেলে গুলি খেলে না ?

আমরা থাকতাম একতলার ফ্ল্যাটে। এখন সেটার দরজা বন্ধ। কমলেশ কি সেটাই নিয়েছে ?

না, কমলেশ দোতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো।

আমি ওর পাশাপাশি উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলাম, একতলায় কে থাকে রে ?

—এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক। কেন বল তো ?

—এমনিই।

দোতলায় এসে আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। মনে হলো, সামনের বারান্দায় দেখতে পাবো ঝুমাকে। একটা গোলাপী রঙের স্কার্ট পরা, হাতে একটা ডিসে আচার। আচার খেতে দারুণ ভালবাসতো ঝুমা। ঝুমা আমাকে দেখেই ডাকবে, এই নীলু! আয় আচার খাবি ?

তারপরই হাসি পেলো। মাঝখানে কতগুলো বছর কেটে গেছে। ঝুমার বিয়ে হয়ে গেছে সেই কবে! তার শ্বশুরবাড়ি কোথায় তা-ও জানি না। ঝুমা যদি এখন এখানে থাকেও, আমাকে দেখতে পেলে আর আচার খেতে ডাকবে না। চট করে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। আমার জুলপি এখন সাদা।

দোতলার বারান্দায় কারুকে দেখতে পেলাম না। একটা ঘরের দরজা খোলা, ভেতরে কে যেন আছে ; দেখা যাচ্ছে না। ঝুমা ছিল বাড়িওয়ালার মেয়ে। ওর বাবা-মা নিশ্চয়ই এখানেই আছেন।

কমলেশ তেতলায় উঠে এলো। ও ছাদে যাচ্ছে কেন? ছাদে গিয়ে কি করবে?

তিনতলায় উঠে আমি নিজেই অবাক। ছাদটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আগে ছিল শুধু একটা চিলেকোঠা। এখন সেখানে দুটো নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে। ছোট্ট দু কামরার ফ্ল্যাট।

এই ছাদে আমি ঘুড়ি ওড়াতাম। দারুণ নেশা ছিল ঘুড়ি ওড়াবার। ঝুমাকে অনেক সময় আমার লাটাই ধরতে দিতাম।

ছাদে সেই সময় একটা রেডিওর এরিয়াল টাঙানো ছিল বলে আমার ঘুড়ি ওড়াবার অসুবিধে হতো খুব। প্রায়ই ইচ্ছে হতো এরিয়ালটা লুকিয়ে লুকিয়ে কেটে দিই। এখন ট্রানজিস্টারের যুগ। এখন আর রেডিওর এরিয়াল টাঙাবার দরকার হয় না। তার বদলে এক রয়েছে টেলিভিসানের অ্যান্টেনা!

যে বাসাটায় চিলেকোঠাটা ছিল, ঠিক সেইখানেই কমলেশের ফ্ল্যাট। যে চেয়ারে আমি বসলাম, ঠিক সেইখানেই, চিলেকোঠার মধ্যে আমি একটা চেয়ারে বসতাম। চিলেকোঠাটা ছিল আমার দারুণ প্রিয়।

কমলেশ তার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। বেশ সুন্দর মেয়েটি। প্রথমেই চোখে পড়ে তার মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল। একটু আগেই বোধ হয় স্নান করেছে। চুলগুলো পিঠের ওপর তাল হয়ে আছে। মেয়েটির নাম নন্দিতা।

সে আমাকে দেখে বললো, আপনাকে কিন্তু আমি আগে থেকেই চিনি।

কমলেশ বললো, এই রে, সেরেছে! নন্দিতা তুমি কি আগে সুনীলের সঙ্গে প্রেমটেম করেছো নাকি?

আমি বললাম, কই, আমি সেরকম চান্স পাইনি তো! কিন্তু তুমি কি করে আমাকে চিনলে? আমার তো মনে পড়ছে না।

নন্দিতা বললো, শুভ্রাংশুদা আপনার বন্ধু না? শুভ্রাংশু ঘোষ। চন্দননগরে আপনি ওঁদের বাড়িতে অনেকবার গেছেন।

আমি বললাম, তা গেছি অবশ্য। শুভ্রাংশু তোমার কে হয় ?

—কেউ হয় না। চন্দননগরে ওঁদের পাশের বাড়িতেই আমি থাকতাম শুভ্রাংশুদার ছোট বোন কেয়া আমার খুব বন্ধু ছিল। সেই সময় আপনাকে দেখেছি।

—কেয়া এখন কোথায় ?

—কেয়া মারা গেছে, জানেন না? কুলু মানালিতে বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে বাস অ্যাক্‌সিডেন্টে···

আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। ফুটফুটে চেহারার মেয়ে ছিল কেয়া। সে আর নেই ? এই জন্যই পুরনো কালের কারুর খোঁজখবর নিতে সাহস হয় না।

কমলেশ তাড়াতাড়ি কথাবার্তা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলো। সে তো আর কেয়াকে চোখে দেখেনি, সুতরাং কেয়ার জন্য তার দুঃখ হতে যাবে কেন ?

খানিকক্ষণ বেশ আড্ডা জমে গেল। কমলেশ বেশ মজা করে অফিসের গল্প করতে পারে। সে একাই কথা বলতে লাগলো।

আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, এই ফ্ল্যাটটা কি করে ভাড়া পেলি ? কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ?

কমলেশ বললো, না। ফ্ল্যাট পাওয়া কি আজকাল চাট্টিখানি কথা ! একতলায় যে ভদ্রলোক থাকেন, মিঃ নায়ার, উনি আমাদের অফিসের কলিগ, উনিই সন্ধান দিয়েছিলেন—এটা তক্ষুনি খালি হয়েছে !

—অপরেশবাবু বাড়িওয়ালা হিসেবে কী রকম ?

কমলেশ চমকে গিয়ে বললো, অপরেশবাবু কে ? আমাদের বাড়িওয়ালার নাম তো রথীন ঘটক। ইনকাম ট্যাক্সের উকিল।

অর্থাৎ ঝুমার বাবা অপরেশ সান্যাল বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন। ওঁদের ফ্যামিলিতে কেউ উকিল ছিল না। এক হিসেবে আমি এতে খুশীই হলাম। ওরা কেউ আর এ বাড়িতে নেই, সেটা ভালোই হয়েছে। কমলেশ আর ওদের কোনো খবর বলতে পারলো না। ঝুমা, তার দিদি শান্তা, ওদের দাদা রত্নেশ্বর—এদের আমি যে বয়সে দেখেছিলাম, আমার

স্মৃতিতে তারা সেই বয়েসেই থেকে যাবে। ওদের কারুর কোনো দুর্ঘটনা হয়েছে কিনা তা আর আমি জানতে পারবো না।

কমলেশ জিজ্ঞেস করলো, তুই এই বাড়ির কাউকে চিনতিস?

—এক সময় আমরা এই বাড়িতে থাকতাম।

—তাই নাকি! কোথায়?

—এক তলায়।

—ঠিক আছে, যাবার সময় তোকে একবার মিঃ নায়ারের ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবো। তোর নিশ্চয়ই অনেক স্মৃতি আছে?

খানিক বাদে কমলেশ বললো, একটু ব্র্যাণ্ডি খাবি? আমার কাছে আছে খানিকটা।

আমি নন্দিতার দিকে তাকালাম।

নন্দিতা হেসে বললো, আপনি ভাবছেন, আমি আপত্তি করবো কিনা? না, আপনারা খেতে পারেন। আমি ছেলেবেলা থেকে আমার বাবাকে ঐ সব খেতে দেখেছি—তাই ঐ সব জিনিস সম্পর্কে আমার কোনো ভয় নেই। আমার বাবা ছিলেন দারুণ ভালো লোক।

আমি বললাম, যাক, তা হলে আর তোমাকে পছন্দ না করার আর একটাও কারণ রইলো না। বন্ধুর স্ত্রীরা সুন্দরী হলেও এই সব সামান্য ব্যাপারে নিয়ে যদি বকাবকি করে, তা হলে তাদের কাছে আমার যেতে ইচ্ছে করে না।

ব্র্যাণ্ডি সমেত গেলাসটা হাতে নিয়ে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। যেন আমি আমার পনের বছর বয়সে ফিরে গেছি, সেই ভাবে, সেই চিলেকোঠায় বসে আছি, অথচ হাতে ব্র্যাণ্ডির গেলাস! এটা সাংঘাতিক বেমানান! ঝুমা যদি আমাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলে?

চিলেকোঠাটাই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। এটা ছিল বাড়িয়ালাদের সম্পত্তি, ভাড়া হয়নি। পুরনো জিনিসপত্র রাখার গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

আমার স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার আগে ঝুমার বাবা আমাকে এই ঘরটা ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। আমাদের ফ্ল্যাটে জায়গা বেশি ছিল না,

আমার পড়াশুনার খুব অসুবিধে হতো। উনি আমাকে ঘরটা ছেড়ে দেওয়ায় আমি দারুণ খুশী হয়েছিলাম। সেই প্রথম আমার নিজের আলাদা একটা ঘর। আর ছাদের ঘর মানেই আলাদা একটা জগৎ, হোক না ঘরটা ছোট এবং জিনিসপত্রে ঠাসা, তবু আমার আনন্দের শেষ ছিল না। জিনিসপত্র খানিকটা সরিয়ে সেখানে একটা চেয়ার টেবিল্স পাতা হয়েছিল এখন যেখানে বসে আছি ঠিক সেই জায়গায়।

সারাদিন এই ঘরটায় থাকতাম। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। দুপুরে আর রাত্রিবেলা শুধু নীচে খেতে যাই। বাকি সময়টা আমি একা এই ঘরের অধীশ্বর! রাত্তিরে খেয়ে আবার উঠে আসতাম—থাকতাম বারোটা একটা পর্যন্ত।

পরীক্ষার ঠিক তিনদিন আগে রাত্রিবেলা আমি মগ্ন হয়ে একটা বই পড়ছি, কে যেন পেছন থেকে আমার কাঁধে হাত দিল। আমি চমকে উঠলাম দারুণ! পেছন ফিরে দেখি ঝুমা!

আজও স্পষ্ট মনে আছে, একটা হলুদ রঙের স্কার্ট পরে আছে ঝুমা। মুখে ক্রিম মাখা। চুলগুলো খোলা। দু চোখে খানিকটা রহস্যময় ঝিকমিকি। আমার তখন পনেরো বছর বয়েস, ঝুমার চোদ্দ।

ঝুমা বললো, দেখতে এলাম, তুই কী রকম পড়াশুনা করছিস!

ঝুমার সঙ্গে আমার বেশি ভাব। ওর দিদি শান্তা সেটা পছন্দ করে না। শান্তা প্রায়ই বকুনি দেয় আমাকে। ঝুমা আমাদের নীচতলায় গল্প করতে গেলে শান্তা অমনি ডাকাডাকি করে।

শান্তা আর ঝুমা এক খাটে ঘুমোয়। এত রাত্রে শান্তা নিশ্চয়ই জেগে নেই, তাই ঝুমা উঠে এসেছে।

আমি বললাম, শান্তা যদি হঠাৎ জেগে ওঠে? তা হলে?

ঝুমা ঠোঁট উল্টে বললো, উঠুক! বয়ে গেছে! কিন্তু এই বুঝি তোর পরীক্ষার পড়া হচ্ছে! দাঁড়া, মেসোমশাইকে বলে দিচ্ছি!

আমি বইটা লুকোবার সময় পাইনি। তখন আমি বুদ্ধদেব বসুর একটা উপন্যাস পড়ছিলাম। পরীক্ষার ঠিক আগেই কেন জানি না, গল্পের বই পড়তে বেশি ইচ্ছে করে। বইটা আজই পেয়েছি, শেষ না

করে ফেললে অন্য পড়ায় মনই বসবে না।

ঝুমা ঝুঁকে পড়ে বললো, দেখি কী বই?

তারপর ও নিজেই পড়তে শুরু করলো। আমিও। ঝুমা আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে। আমি ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরেছি এক হাতে। ঝুমার গা থেকে একটা অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ ভেসে আসছে।

রাত প্রায় বারোটা। চারদিক নিঝুম। আমি আর ঝুমা সেই গল্পের বই পড়ায় ডুবে গেলাম। আর (এমন একটা রোমান্টিক প্রেমের দৃশ্য যে সেই জায়গাটা) শেষ না করেও ছাড়া যায় না।

গল্পের এক জায়গায় নায়ক তার তার নায়িকার ঠোঁটের তুলনা করছে গোলাপের পাপড়ির সঙ্গে। এক সময় যেই তার ঠোঁট ছোঁয়ালে সে গোলাপের পাপড়িতে, অমনি শিরায় শিরায় জ্বলে উঠলো আগুন।

সেই জায়গায় আমি বইটা মুড়ে রাখলাম। ঝুমা জিজ্ঞেস করলো, কী হলো? এই চ্যাপ্টারটা শেষ করে নিই।

আমি বললাম, আমার জীবনে ও রকম কখনো হয়নি!

—কী?

—ঐ যে, শিরায় শিরায় আগুন।

—যাঃ অসভ্য!

—ঝুমা, তোরও তো গোলাপের পাপড়ির মতন ঠোঁট···একবার!

—ভ্যাট! অসভ্যতা করবি না, নীলু!

—কী হয়েছে? শুধু একবার। দেখবো, ও রকম হয় কিনা।

—না!

—লক্ষ্মীটি, ঝুমা, একবার—এতে তো কোনো ক্ষতি হয় না, শুধু একটা অভিজ্ঞতা। কেউ তো দেখছে না।

একটুক্ষণ চিন্তা করে ঝুমা, বললো, ঠিক একবার কিন্তু, তার বেশি নয়।

তারপর নিজেই ওর মুখটা এগিয়ে আনলো আমার মুখের কাছে। ওর মুখটা লালচে হয়ে গেছে, একটু একটু কাঁপছে। আমি ওর গলা

জড়িয়ে ধরে—

—কী হলো, আপনি এত অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন কেন ?

—অ্যাঁ ?

আমি চমকে উঠলাম, আমার ঘোর ভেঙে গেল। আমি কমলেশ আর নন্দিতার সামনে বসে আছি। হাতে ব্র্যাণ্ডির গেলাস। সেই চিলে-ঘরটাও আর নেই। অথচ আমি ফিরে গিয়েছিলাম আমার পনেরো বছর বয়সে, ঝুমার সামনে, সেই আমার প্রথম চুম্বনের রোমাঞ্চ। ঠিক সেই রকম আমার বুক কাঁপছে। আমার রোমগুলো খাড়া হয়ে গেছে, আমার ঠোঁটে ঝুমার তুলতুলে গোলাপের পাপড়ির মতন ঠোঁটের স্বাদ।

একটু পরে উঠে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে নামছি, তখন দেখলাম, দোতলার কাছে একটি কিশোরী মেয়ে তার চেয়ে দু-এক বছরের বড় একটি ছেলের হাতে একটা বই দিচ্ছে। গল্পের বই-ই মনে হয়। ঐ বইটার মধ্যে কোনো চিঠি নেই তো ? আমরা ঐ ভাবে চিঠি বিনিময় করতাম। ছেলেটার মুখে একটা সলজ্জ ভাব।

আমার মনে হলো, সেই পনেরো বছরের আমি যেন এই সিঁড়িতে এসে আবার দাঁড়িয়েছি ঝুমার সামনে। মেয়েটিও তো অবিকল ঝুমার মতন। কিছুই হারায় না, সবই থাকে।

## ধুলো মাখা হীরে

একঠো কালীঘাট।

আমি ভেবেছিলাম শুধু আমিই বুঝি মেয়েটিকে লক্ষ্য করছি। তা নয়, মেয়েটি কথাটা বলা মাত্রই পাঁচ-সাতজন লোক আঁতকে উঠে তৎক্ষণাৎ সমস্বরে বলে উঠল, কালীঘাট, কালীঘাট এদিকে কোথায় ? এমন কি মদ্রদেশবাসী দাড়িওয়ালা ড্রাইভার পর্যন্ত মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটিকে দেখলো।

ব্যারাকপুরের বাস, চিড়িয়ার মোড় পেরিয়ে ছুটছে। সকাল সাড়ে আটটা।

মেয়েটি বাঁ-হাতে একটা চক্‌চকে সিকি উঁচু করে ধরেছিলো, আস্তে আস্তে সেটা নামিয়ে কেমন অভূতপূর্ব চোখে তাকাল। জানলা দিয়ে একটা রোদ্দুরের তীর তার বুক ভেদ করে ওদিক পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে।

জানলার ওপর কনুই ভর দিয়ে হেলে বসেছিল মেয়েটি, বাঁ পাটা একটু উঁচু করে তুলে রেখেছে। আমি অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখছিলাম। একমাথা সোনাঝুরি লতার মতো হিজিবিজি ময়লা চুল, আঙুল দিয়ে মাঝে মাঝে পিছনে টেনে সরিয়ে দিচ্ছিল। এক পর্দা ধুলো সত্ত্বেও বোঝা যায় মেয়েটির গায়ের রঙ সত্ত রঙধরা আপেলের মতো, বয়েস চোদ্দ থেকে একুশের মধ্যে নিশ্চয়ই। চোখের মণি দুটি কটা, বন-বিড়ালের মতো ভয়ংকর সরল। ঘাগরা আর কাঁচুলি পরে আছে, কাঁচুলির ঠিক মধ্যে দিয়ে একটি রূপালি স্ট্র্যাপ দেওয়া—মাঝে মাঝে রোদ্দুরে যা ঝল্‌সে উঠছে।

নিশ্চয়ই বেদেনী, অথবা যাযাবরী, আমি ভেবেছিলাম,—অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ ভিখারিনী। বহু গল্পে পড়েছি এদের কথা, চলচ্চিত্রে দেখেছি, কলকাতাতেও কোথাও কোথাও, কার্জন পার্কের পাশে, হাওড়া ময়দানে কখনও চোখে পড়েছে, দলবল সুদ্ধ, ছাগল-খচ্চর মোটঘাট সমেত। কিন্তু এমন একলা, এ রকম বাসে, এই সুকুমার সকালবেলায় দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আকৃষ্ট বোধ করেছিলাম। মফস্বল-মুখী বাসের বিবর্ণ এবং পিষ্ট চেহারার মানুষের ভিড়ে এই মেয়েটিকে মনে হল আকস্মিক প্রাপ্তির মতো।

···'বাস্ রোক্‌কে, এখানে নামিয়ে দাও, উল্টাদিক্‌কা বাস্‌মে উঠো···' কিছু লোক চেঁচিয়ে উঠল। ব্যারাকপুরের দিকে কালীঘাট কোথায়! বাস থেমে গেল, মেয়েটি একটি বিচিত্র ভ্রূভঙ্গী করে সতেজ পায়ে নেমে গেল। যেন কালীঘাট পৌঁছনো সম্বন্ধে তার কোন দ্বিধা নেই।

আমি ছটফট করছিলাম। যেন আমার বুক থেকে কোনো এক অস্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুল বোধ করছিলাম আমি। জানলা দিয়ে অনেকখানি মুখ বাড়িয়ে ছিলাম, তারপর বাস একটু চলতে শুরু করতেই আমি যেন আমার কোনো বন্ধুকে দূরে দেখতে পেয়েছি, এই

ভঙ্গী করে তৎক্ষণাৎ বাস থেকে ছিট্‌কে নেমে পড়লুম।

আমার পরিধানে ভদ্র পোশাক, দাড়ি কামানো চক্‌চকে মুখ, কোনো গম্ভীর কার্যে ব্যারাকপুর যাচ্ছিলাম। কিন্তু এই অস্বাভাবিক মেয়েটি কেন এই অসময়ে, এইখানে বাসে উঠেছিল এবং কোনোদিনও সে কালীঘাটে পৌঁছুবে কিনা—এ কথা জানবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছে বোধ করলুম। মনে হল, এ কথা জানতে না পারলে, এই কৌতূহলের অসুখে আমাকে বহুদিন ভুগতে হবে।

চক্‌চকে কালো পিচ-ঢালা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল। রোদ্দুর তার দেহের চেয়েও ছোট ছায়া ফেলেছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মেয়েটি হঠাৎ বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে এক পাক ঘুরে গেল—তারপর অকারণে রাস্তার অন্য পারে চলে গেল এক ছুটে।

একি! আবার ও ব্যারাকপুরের বাসে উঠতে চায় নাকি? আমি একটু দূরে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে পারিনি, মনে হচ্ছিল, রাস্তার প্রত্যেকটি লোক ভেবে নিয়েছে যে আমি মেয়েটির জন্য দাঁড়িয়ে আছি, এখন রাস্তার ওপারে মেয়েটির কাছে আর যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দূরে একটা বাস আসছে, আমি চোরা চোখে চেয়ে দেখলুম, নর্দমার ধারের একটি বন-তুলসীর ফুলহীন ডাঁটা ভাঙবার চেষ্টা করছে সে। হঠাৎ চলন্ত গাড়ির সামনে দিয়েই প্রায় ছুটে এপারে এল, এবং সদ্য থামা বাসে উঠে পড়ল। অন্য দরজা দিয়ে উঠলুম আমি। ওর দিকে সোজা মুখ করে বসলুম।

—কাঁহে নেই কালীঘাট যায়গা?

এবার কণ্ডাক্টারের প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে সে দৃপ্ত ভঙ্গীতে রুখে উঠল। যেন রাস্তার দু দিকের কোনো দিকের বাসই কালীঘাট যাবে না—এ ত্রুটি সে সহ্য করবে না। সহৃদয় ভদ্রমহোদয়গণ এবং কণ্ডাক্টার তাকে বুঝিয়ে দিলে যে শ্যামবাজার গিয়ে বাস বদল করতে হবে। এটুকু বোঝাবার জন্য তাদের অনেক বাক্যব্যয় করতে হল, যতক্ষণ না বাস শ্যামবাজারে এসে থামল।

তখন শ্যামবাজার অঞ্চল মানুষের ভিড়ে লিবিয়ার জঙ্গলের মতো। সেখানে মেয়েটিকে বড় সামান্য এবং অসহায় মনে হল। আমার ইচ্ছে হয়েছিল, মেয়েটিকে যত্ন করে কোনো কালীঘাটের বাসে তুলে দিই। কিন্তু তখন উল্টে আমার এই ভয় হচ্ছিল যে, যদি সে আমায় চিনে ফেলে কোনো কথা বলে, কোনো মিনতি কিংবা আদেশ করে, তবে আমার ভদ্র পদবী বিচলিত হবে, এক হাজার লোক আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসবে। আমি চোরের মতো মেয়েটির পিছন পিছন আসতে লাগলুম নিঃশব্দে।

ততক্ষণে অফিস-যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়েছে। হৌসের বাবুরা পানের ডিবে হাতে করে ধীর স্থির ভাবে প্রতীক্ষা করছে গাড়ির। জামার কলার চক্‌চকে ইস্ত্রি করা, সকলেরই ভিজে মাথায় চিরুনির চিহ্ন আছে। কেরানীরা জামার হাতায় বোতাম লাগাতে ভুলে গিয়ে পরস্পর অনেক কথা বলাবলি করছে। শোভন পোশাকে সজ্জিত হয়ে মেয়েরা ধীর স্থির ভাবে একটু বাদেই প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে ওঠার জন্য প্রতীক্ষা করছে। ট্রাম-বাসের পাদানিতে পা রাখবার জন্য পরম যত্নে শাড়িটা একটু উঁচু করছে।

এই প্রসঙ্গে বেদেনী মেয়েটির উপস্থিতি বিরল ব্যতিক্রমের মতো। ফুটপাতের রেলিঙে পা তুলে সে ঘাগরার হাঁটু পর্যন্ত তুলে পরম অভিনিবেশ সহকারে পা চুলকোচ্ছে এবং কোনো ব্যথার জায়গায় হাত বুলোচ্ছে। তারপর সে মাথা থেকে একটা উকুন বার করে দুই বুড়ো আঙুলের নখে টিপে শব্দ করে মেরে—নাকের কাছে হাত এনে রক্তের গন্ধ শুঁকলো। তারপর পিছন ফিরে হঠাৎ তীব্র চোখে আমার দিকে চেয়ে একটা বাসে উঠে পড়ল।

আমি শিউরে উঠলুম, এবং বলবার চেষ্টা করলুম, ও বাস নয়, বাস কালীঘাট যাবে না, হাওড়া যাবে। বলা হল না। মাথা দিয়ে ঢুঁ মেরে ভিড় সরিয়ে নির্বিকারভাবে মেয়েটা ভিতরে ঢুকে গেল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আমাকে এখন জরুরী গম্ভীর কাজে ব্যারাকপুর যেতে হবে। সারাদিন এক ছাঁচের এক মাপের মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে

হবে। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে, কোনোদিন কালীঘাট পৌঁছবে কিনা, সকালবেলা কোথা থেকে ও এসেছিল—এই না-জানা রহস্যগুলি আমাকে যাবার পথের একা বাসের জানলার চারপাশের অন্যসব দৃশ্যগুলি সম্পর্কে অন্ধ করে রাখবে।

## মনে পড়ে

পুজোর দিনগুলো এলেই আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। এক-একটা স্মৃতি এমনভাবে গেঁথে যায় যে তা আর কখনো মোছে না। বরং দিন দিন যেন সেই সব ছবি আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ঢাকের বাজনা শুনলেই মনে পড়ে যায় গ্রামের কথা। শহরের শান-বাঁধানো ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে ভিজে মাটির রাস্তা ধরে একসময় দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে শিউলি ফুল কুড়িয়ে আনতাম।

আমরা প্রত্যেক বছর পুজোর সময় যেতাম আমাদের দেশের বাড়িতে। পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে। এখনও সেই গ্রামের কথা ভেবে আমার বুক টনটন করে। আর এক জেনারেশন পরে কেউ আর ওসব গ্রামের কথা মনেই রাখবে না।

তখন ক্লাস এইট-নাইনে পড়ি। কলকাতা থেকে যখন যেতাম গ্রামে। আজ সেখানকার সমবয়সী ছেলেদের মধ্যে আমার প্রায় বিলেত-ফেরতের সম্মান। স্টিমারঘাটায় তারা সবাই ভিড় করে দাঁড়াতো, অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো আমার দিকে। আমি ঘটিদের ভাষায় কথা বলতে পারি। আমার গায়ে কলার দেওয়া চেন লাগানো হলুদ গেঞ্জি। অন্য সবাই ইজের পরে, আমার বক্‌লস লাগানো হাফ-প্যাণ্ট। পায়ে নটিবয় সু আর মোজা। অন্য সব ছেলেদের খালি পা। একরকম সাদা লম্বা লম্বা লজেঞ্চুস পাওয়া যেতো তখন, মুখে দিলে দূর থেকে মনে হতো অবিকল সিগারেট। আমি সেটা মুখে দিয়ে সেইসব ছেলেদের সামনে শহুরে ঢং-এ হা হা করে হাসতাম। তারা আরও অবাক হয়ে যেতো।

অবিলম্বেই অবশ্য আমি জুতো-মোজা খুলে মিশে যেতাম ওদের সঙ্গে। আর কলকাতা সম্পর্কে শোনাতাম অনেক রোমহর্ষক গল্প। সবই বানিয়ে বানিয়ে। আর গ্রামের ছেলেরা আমাকে শেখাতো লগি দিয়ে নৌকো চালানো কিংবা খেজুর গাছে সন্ধ্যেবেলা উঠে রস চুরি করা। একবার খেজুর গাছে উঠতে গিয়ে ধপ করে পড়ে গিয়েছিলাম জলে। ভাগ্যিস কিছুদিন আগেই সাঁতার শিখে নিয়েছিলাম। পুকুরটা ছিল আমাদের বাড়ির পেছন দিকে। খুব মাছ ছিল সেটাতে। বিশেষ করে পুঁটি মাছ। আমি সকালবেলা ছিপ হাতে নিয়ে গিয়ে বসতাম। বঁড়শির ডগায় ভাত গেঁথে তুলতাম চকচকে রুপোলী পুঁটি। মাঝে মাঝে যখন দু-একটা কাৎলার বাচ্চা বা নলা (ছোট রুই) উঠতো, তখন আর আনন্দের শেষ নেই। সেই মাছ এনে পিসীমাকে বলতাম, এক্ষুনি ভেজে দাও তো আমি লেবু পাতা নিয়ে আসছি ততক্ষণ। কলকাতায় চায়ের সঙ্গে আমরা মাখন টোস্ট খেতাম। কিংবা সিঙাড়া, নিমকি। গাঁয়ে তখন পাঁউরুটি দেখেছে খুব কম লোক, কার নিমকি সিঙাড়া পাওয়া যায় মাদারিপুর শহরে, অনেক দূরে, বছরে একবার দুবার লোকে সেসব খায়।

কলকাতায় পান্তাভাত খেলে সবাই বাঙাল বলবে বলে কখনও খাইনি। কিন্তু গ্রামে গিয়ে খুব পান্তাভাত খেতে ইচ্ছে করতো আমার। কাঁচা লঙ্কা, বাসি পান্তা আর নিজের হাতে ধরা মাছ ভাজা, সঙ্গে লেবুর পাতা। মাংসে তেজপাতার মতো ভাতের মধ্যে আমি তিন-চারটে লেবুর পাতা ফেলে দিতাম। সাদা ধবধবে ভাতের মধ্যে টাটকা সবুজ লেবুপাতা দেখায়ও কত সুন্দর! লেবুপাতা আনতে যেতাম বুলুদিদের বাগান থেকে। বুলুদিরা গরীব। আমার বাবার মতন ওদের বাড়ির কেউ তো আর কলকাতায় চাকরি করে না। সামান্য কিছু চাষের জমি ছিল ওদের। আর নিজেদের বাগানের আম-জাম-লেবু-নারকোল বিক্রি করতো সব সময়। লেবুই থাকতো সারা বছর। বিশাল ওদের লেবু বাগান। আমার লেবুতে লোভ ছিল না, আমি শুধু পাতা ছিঁড়তে যেতাম। সেই-জন্য বুলুদির বাড়ির কেউ আপত্তি করতো না।

এক এক দিন দেখা হয়ে যেতো বুলুদির সঙ্গে। খুব সুন্দর ভাবে হেসে কথা বলেন। একবার আমার পায়ে খুব বড় একটা কাঁটা ফুটে গিয়েছিল। বুলুদি চাবি গরম করে সেই কাঁটা বার করে দিলেন।

একদিন বুলুদি আমাকে সেই বাগানের মধ্যে বললেন, এই নীলু, তুই আমার একটা কাজ করে দিবি? তার বদলে তোকে একটা জিনিস দেবো।

আমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, হ্যাঁ।

বুলুদি বললেন, এখানে নয়, তুই আমার সঙ্গে আয়—

বুলুদি ফিসফিস করে কথা বলছিলেন। তাতেই বুঝেছিলাম, ব্যাপারটা গোপন। লেবুবাগান ছাড়িয়ে পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে যে দিকটায় শুধু জারুল আর সুপুরির জঙ্গল, রাত্তিরে এই দিক থেকে শোনা যায় শেয়াল আর ভামের ডাক। বুলুদি আমাকে নিয়ে সেখানে শুকনো পাতার ওপরে গিয়ে বসে বললো, আমাকে একটা চিঠি লিখে দিবি?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

মনে মনে আরও অবাক হয়ে গেলাম। একটা চিঠি লেখার জন্য এত গোপনীয়তা কেন? চিঠি তো ঘরে বসেই লেখা যায়! তা ছাড়া কাকে চিঠি লিখবে বুলুদি? ওদের সবাই তো এই গ্রামেই থাকে। বুলুদিরা অনেক ভাইবোন। বাড়ির অবস্থা ভালো নয় বলে ওরা কেউই বেশি লেখাপড়া শেখেনি। বুলুদি বোধ হয় ক্লাস টু পর্যন্ত পড়েছিলেন।

বুলুদি আঁচলের তলা থেকে একটা কাগজ আর একটা এফ. এন. গুপ্তর উড পেন্সিল বার করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী লিখবো বুলুদি?

বুলুদি লজ্জায় মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে বললো, লেখো, তুমি আমাকে ভুল বুঝিও না···আমি কোনো অপরাধ করি নাই···

—কাকে লিখবো বুলুদি? ওপরে নাম লিখতে হবে না?

—সে তোর জানবার দরকার নেই।

কিন্তু পরে আমি জেনেছিলাম, এই চিঠি মানিকদাকে উদ্দেশ্য করে লেখা। সে গ্রামের ফুটবল টিমের ক্যাপটেন। ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েই

গ্রামের ছেলেদের সর্দার।

বুলুদি মুখে মুখে বলতেন, আমি লিখে দিতাম। তখনও কৈশোর পার হইনি, নারী-পুরুষের ব্যাপার সঠিক বুঝি না। তবে, অস্পষ্ট-ভাবে মনে হতো একটা দারুণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার আছে এর মধ্যে। বুলুদির চিঠির মধ্যে এই সব থাকতো···তুমি কি বোঝো না আমাদের কত বিপদ···তুমি যখন-তখন যাইতে বলো, কিন্তু আমি কি সব সময় যাইতে পারি···!

এক-একটা সেনটেন্স বলতে অনেক সময় লাগতো বুলুদির। ফর্সা মুখখনা লজ্জার লাল আভায় আরো সুন্দর দেখাতো। তখন বুলুদির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। কিন্তু বুলুদিরা গরীব এবং ব্রাহ্মণ। টাকা না থাকলে ব্রাহ্মণের মেয়ের অত সহজে বিয়ে হয় না। তখনকার গ্রামে সৌন্দর্যের কোনা দামই যেন নেই। বুলিদির বিয়ের জন্য তাঁর বাড়ির কেউ চিন্তাই করতো না।

চিঠি লেখার বদলে বুলুদি আমাকে কিছু একটা জিনিস দেবেন বলতেন। কিন্তু কিছুই দিতেন না। তবে হঠাৎ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভিজে ঠোঁট দুটো গালে চেপে ধরতেন। গরম সেই ঠোঁট, সেই বুঝি কিছু দেওয়া? কি জানি, তখন ঠিক বুঝতাম না। এখন মনে হয় অনেক কিছু।

কেন জানি না মানিকদাকে চিঠি লেখা আমার পছন্দ হতো না। মানিকদা কেমন যেন রুক্ষ চোয়াড়ে ধরনের মানুষ। খেলার মাঠে খুব খারাপ খারাপ কথা বলতো। বুলুদির মতন অমন নরম সুন্দর মেয়ের সঙ্গে মানিকদাকে কিছুতেই আমি মেলাতে পারতাম না। পরের বছর পূজোর সময় গিয়ে শুনলাম, রোমহর্ষক কাণ্ড। সান্যালদের বাড়ির একটি ছেলেকে খুন করার অপরাধে মানিকদার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। সেই ঘটনার পর বুলুদির একটু একটু মাথা খারাপের মতন হয়। ওঁর বাড়ির লোক এক তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধের সঙ্গে বুলুদির বিয়ে দিয়ে আপদ বিদেয় করেন। মানিকদার সঙ্গে বুলুদির সম্পর্কের কথাও লোকে জেনে গিয়েছিলো।

তারও দু' বছর পরে শুনেছিলাম বুলুদির বিধবা হবার খবর কিন্তু বুলুদি আর বাপের বাড়ি ফেরেননি। পরে নাকি তাঁর মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যায়। তারপর বুলিদি কোথায় হারিয়ে গেলেন, আর তাঁকে দেখিনি, তাঁর কথাও শুনিনি।

তারপর কেটে গেলো পঁচিশ বছর। আর কখনো ফিরে যাইনি সেই গ্রামে, আর দেখিনি সেই লেবুবাগান। এখন বাঙাল ভাষাটাষা ভুলে একদম শহুরে। পূজোয় মধুপুর, দেওঘর বা পুরীতে বেড়াতে যাই। তবু হঠাৎ হঠাৎ ঢাকের বাজনায় মনে পড়ে যায় দেশের কথা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বুলুদির মুখ। বুলুদির সরল চোখ যেন এখনো আমার দিকে চেয়ে আছে।

সেই কথা ভাবতে ভাবতে মনে হয়, আমি ছাড়া এ-পৃথিবীতে বুলুদিকে কেউ ভালোবাসেনি। বুলুদির কোনোদিন বয়স বাড়বে না। সেই লেবুপাতার গন্ধ মেশা দিনগুলির সঙ্গে সঙ্গে বুলুদি আমার কাছে চিরযুবতী থেকে যাবেন।

## কলকাতায় ভোর

ভোরবেলার ট্রাম বাস নানান রঙে ঝলমল করে। শহরে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে না, কিন্তু ভোরবেলা বাসে উঠে অনেকদিন পর নানান পাখির কলকাকলি শুনতে পেলাম।

শীতের সকালে অস্পষ্ট কুয়াশা। পথ এবং পথের দৃশ্য অনেকটা ওয়াশ করা ছবির মতো। খাঁটি নাগরিক কখনও সূর্যোদয় দেখে না, পাখির ডাক শোনে না, ধূসর ছাড়া অন্য রঙের বাহার তার চোখে পড়ে না। সভ্যতা প্রকৃতিবিরোধী। আজ কপালদোষে ভোরবেলাতেই যেতে হবে আমাকে এক শহরতলী অঞ্চলে। তাই ব্রহ্মমুহূর্তে উঠে ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করতে হয়েছে, চা পর্যন্ত না খেয়ে এবং সকালের যেটি সবচেয়ে প্রধান কাজ—সেই খবরের কাগজ পড়াও বাকি রেখে বাড়ি থেকে

বেরুতে হয়েছে। হাতঘড়িটা ঠাণ্ডা, ছটা কুড়ি বাজে।

প্রথম বাসে অসম্ভব ভিড়। স্টপেজে দাঁড়াল না। পরের বাসে অতি কষ্টে উঠলুম। উঠেই চোখ ঝলসে গেলো। চারদিকে লাল হলুদ জাফরান সবুজ শ্বেত রঙ এবং রেখার বিদ্যুৎ। নানান সুরের সরল, দ্বিধাহীন কচি কণ্ঠস্বর। সমস্ত বাসে আমাকে নিয়ে তিনজন মাত্র পুরুষ। বাকি দুজন কণ্ডাক্টর এবং ড্রাইভার। এ ছাড়া সমস্ত সীটে প্যাসেজে বসে দাঁড়িয়ে সুন্দর সুন্দর পোশাক পরা তরুণী এবং বালিকা।

প্রথমে ভেবেছিলাম—পিকনিকের জন্য রিজার্ভ বাস, পরে বুঝতে পারলুম, না। এরা সব স্কুল-কলেজের মেয়েরা। কলকাতায় অনেকগুলি স্কুল-কলেজ সকালে। সেখানে এরা—এত মেয়েরা পড়ে। কলকাতার সব অলিগলি থেকে, এমন কি ট্রেনে করে দূর অঞ্চল থেকে, রোজ আসে। রোজ ওরা এই সময় যায়—যখন আমি বিছানায় শুয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজের প্রথম পাতার হেড-লাইনটা পড়েই আবার একটু ঘুমিয়ে পড়ি এবং একটু বাদে জেগে উঠে শেষ পাতাটায় একবার চোখ বুলিয়ে তারপর ভিতরের ভাঁজ ভাঙি। এমন সকালে বেরুবার সময়ও এত সুন্দর পরিপাটি করে সাজপোশাক করবার সময় ওরা কি করে পায়! কিন্তু সাজপোশাক ছাড়িয়েও প্রথম যৌবনের সুকুমার দীপ্ত আভা ওদের চোখে মুখে ছড়িয়ে আছে।

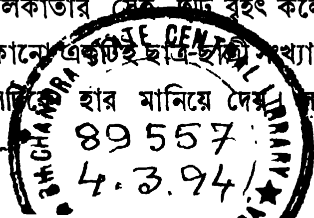
লজিকের অধ্যাপিকার নিন্দে উপভোগ করতে করতে হঠাৎ আমি তরুণ ইংরেজী অধ্যাপকের সম্বন্ধে একটু নিচু গলায় আলোচনা শুনে আরেকটি দলের দিকে মনোযোগী হয়ে পড়লাম।

…কি রকম স্মার্ট দেখেছিস…একটুও হেসিটেট না করে টপ্ টপ্ উত্তর দেয়।

…কাল একটা হালকা ক্রিম রঙের সার্ট পরেছিলেন, না রে?

…সেদিন কিন্তু ভাই হেনা খুব জব্দ করেছিলো!…

বাস এসে কলকাতার সেই দুটি বৃহৎ কলেজের কাছাকাছি এসে থামলো-যার যে-কোনো একটিই ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যায় কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডের মতো ইউনিভারসিটিকে হার মানিয়ে দেয়। সমস্ত গাড়িটাকে নিস্তব্ধ



ধূসর করে ওরা সকলে নেমে চলে গেলো। আমি দোতলায় উঠে গিয়ে জানলার ধারে বসলুম।

শীতের বাতাস অশরীরী নয়। চোখে মুখে স্পষ্ট স্পর্শ বুঝতে পারা যায়। ভালো লাগছে। অনেকটা ছেলেবেলায় ঘুমন্ত মুখে মায়ের স্পর্শের মতো। আস্তে আস্তে বাসে লোক উঠছে—যেন মন্ত্রবলে বাস প্রায় ভর্তি হয়ে গেলো। বিচিত্র রকমের ভোরের যাত্রী। গঙ্গাস্নান ফেরত বৃদ্ধ, দুধের বিলি-ক্যান হাতে লুঙ্গি পরা প্রৌঢ়, কিছু মজুর শ্রেণী, আর স্নান-আহার করা পরিতৃপ্ত মুখের কয়েকজন যে গম্ভীরভাবে বসে আছেন—কি তাঁদের উদ্দেশ্য, কি তাঁদের জীবিকা কিছুই বোঝা যায় না।

আমি নিচু হয়ে একটা রূপোর চুলের কাঁটা পায়ের কাছ থেকে কুড়িয়ে নিলাম। দু আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে কাঁটাটাকে সোজা করলাম অন্যমনস্কভাবে। তারপর আবার বেঁকাতে যেতেই মাঝখান থেকে ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেলো। একটা ছোট্ট ছিমছাম দোতলা বাড়ির বারান্দায় ছুঁড়ে দিলাম এক টুকরো। অপর টুকরোটি কি করব ভেবে পেলাম না। শেষে সামনের সীটের ঘুমন্ত বিশালকায় মারবাড়-নিবাসী ভদ্রলোকের কোটের পকেটেই অজান্তে ফেলে দেবো বলে যখন প্রায় মনস্থ করেছি—সেই সময় বাস এসে থামলো বৌবাজারের মুখে বকুল গাছটার নিচের স্টপে। হাতের কাছেই একটা ডাল পেতে—তার একটা ধুলো-জমা পাতায় কাঁটাটা গেঁথে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের একটা তীক্ষ্ণ রশ্মি তার উপর পড়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলো।

বাস আবার চলতে আরম্ভ করার পর আমার মনে পড়লো, চুলের কাঁটাটা দিয়ে অন্য কিছু করা উচিত ছিলো কিনা। কাঁটার অধিকারণীকে ওটা ফিরিয়ে দেওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো? না, সম্ভব ছিলো না—এ কথা মনে মনে ভেবে আমি নিশ্চিন্ত হলুম। সুতরাং আমি যা করেছি তার চেয়ে আর ভালো কিছু করা সম্ভব ছিলো না ওটা দিয়ে।

কয়েকটা ছোটখাট দোকান খুলতে শুরু করেছে। মুদিখানার সামনে কয়েকশো পায়রা ছোলা খাচ্ছিলো—বাসের তাড়ায় হঠাৎ একটা মোহময়

আওয়াজ করে একসঙ্গে উড়ে গেলো। চায়ের দোকানের সামনে উনুনের ধোঁয়া। শহর জেগে উঠছে। দ্রুত অপস্রিয়মান একটি জানলার টুথ্-ব্রাশ মুখে একটি অলস-চক্ষু নব-বধূর মুখ দেখতে পেলাম।

গাড়িবারান্দাগুলির নিচে খুব কর্মব্যস্ততা। রাত্রির অতিথিরা সব জেগে উঠছে, যাযাবর ভিখিরি, গৃহহীন দিন-মজুররা তাদের বিছানা পাট করছে। একটা বুড়ির পায়ের কাছে বুঝি একটা খেঁকি কুকুর সারারাত শুয়ে ছিলো। বুড়ি সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে তাই দেখে রেগে আগুন্। দূর দূর বলে কুকুরটাকে একটা লাথি মারলো। কুকুরটা সামান্য দূরে সরে গিয়ে কুঁই কুঁই করে ঠিক হাসির মতো আওয়াজ করতে লাগলো। যেন মনে হলো বুড়ির সঙ্গে খুব একটা ঠাট্টা করেছে!

বুড়ি আরও রেগে গেলো মনে হলো। পাশ থেকে একটা লাঠি তুলে নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে কুকুরটার পিঠে বসিয়ে দিলো। কুকুরটা একটা আর্ত শব্দ করে ছুটে এলো রাস্তায়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাড়ির সামনে পড়লো। কোনোক্রমে বেঁচে সামনের দিকে নার্ভাস হয়ে ছুটলো এবং তৎক্ষণাৎ বিপরীতমুখী একটা ট্রাক ওর ওপর এসে পড়লো।

আমি চিৎকার করে উঠলাম।

এই সকালেও কিছু লোক জমে গেলো। আমাদের বাসও থেমেছে কৌতূহলবশত। কুকুরটার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে—তবুও মর্মান্তিক ডাক ডেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পথে।

এত বৃহৎ শহরের জাগরণক্ষণে একটি কুকুরের মৃত্যু কিছুই উল্লেখ-যোগ্য নয়। চোখের আড়ালে তো কত কিছুই মরছে, মরবেই, চোখের সামনে একটা কুকুরকে মরতে দেখা এমন কিছু অভাবনীয় নয়।

কলকাতা শহরে একটি দিনের শুরু হলো। এখনই আরম্ভ হবে কর্মকোলাহল। কোথাও যেন জলের দরে মাটি নিলাম হচ্ছে এই খবর শুনে পথে পথে মানুষ ছুটবে একটু পরে। মেরুদণ্ড-ভাঙা প্রাণীর দাঁড়িয়ে ওঠবার চিৎকার এবং রক্তের ওপর দিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রার দৃশ্য আরও অনেক দেখা যাবে।

আমাদের সকলকেই এখনই ছুটতে হবে। যেতে হবে। এ শহরে সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই।

## কলকাতার নদী

সব বড় শহরের পাশেই নদী আছে। নদী নিয়ে এক একটা শহরের গর্বের অন্ত নেই। রাইন, সীন, টেমস্ এইসব ক্ষুদে ক্ষুদে নদী নিয়ে ইওরোপীয় শহরের কত অহঙ্কার, কত সুন্দর করে তীরভূমি সাজানো, কত প্রেমিক-প্রেমিকার আহ্লাদিত সায়াহ্ন-ভ্রমণ সেখানে।

আমাদের কলকাতার পাশে স্বয়ং সুরধুনী গঙ্গা। অথচ আজ কি দীন-হীনা মূর্তি! তার কারণ হয়তো গঙ্গা শুধু আমাদের কাছে সৌন্দর্যবতী নদীই নয়, এ নদী আমাদের কাছে পরম পুণ্য, পরম পবিত্র। আর আমাদের পুণ্যক্ষেত্র, তীর্থক্ষেত্রেই তো চূড়ান্ত নোংরামি।

সব সভ্যতারই জন্ম নদীতীরে। সিন্ধুনদীর পারেই আর্যরা প্রথম এসে এদেশে ডেরা বেঁধেছিলো। নদীতীরেই বাণিজ্য এবং সমৃদ্ধি—তাই বড় বড় শহরগুলি নদীর উল্লেখযোগ্য বাঁকেই গড়ে উঠেছিল। দৈর্ঘ্যে নয় কিন্তু গৌরবে গঙ্গা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নদী। প্রাচীন বিখ্যাত শহর-গুলির অধিকাংশ তাই গঙ্গাতীরে,—যেমন বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর ইত্যাদি। গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে তুলনীয় নদী পৃথিবীতে আর একটি মাত্র আছে, তার নাম জর্ডন। জর্ডনের জল ক্রিশ্চানদের নবোজাত শিশুর শরীরে ছিটিয়ে দিতে হয়। আর গঙ্গার সঙ্গে হিন্দুমাত্রেরই জন্ম-জীবন-মৃত্যুর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সব নদীই পবিত্র। বহতা জল আর রমতা সাধু কখনও অপবিত্র হয় না। বৌদ্ধশাস্ত্রে একটি সুন্দর কথা আছে। কোনো মানুষই এক নদীতে দুবার স্নান করে না। আজ নদীতে যে-জল বহে গেল, সে জল আর ফিরবে না। কাল নদীতে অন্য জল।

গঙ্গা ত্রিপথগা—তাঁর গতি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে। সুরলোকে তিনি বৈতরণী, মর্ত্যে ভাগীরথী, পাতালে ভোগবতী। হিন্দুদের বিশ্বাস, গঙ্গা

সমস্ত পাপ হরণ করে, গঙ্গাস্নান সমস্ত পুণ্যের সার, যতক্ষণ মানুষ গঙ্গায় ডুবে থাকে ততক্ষণ সে সমস্ত প্রকার পাপ থেকে মুক্ত থাকে। এই বিশ্বাসেই এক সময়ে মানুষকে মৃতুকালে অন্তর্জলী যাত্রা করানো হতো। মৃতুপথযাত্রীর পা ডুবিয়ে রাখা হতো গঙ্গায়। যারা গঙ্গা থেকে দূরে নিবাসী, তাদের প্রত্যেকের মৃত্যুকালে মুখে গঙ্গাজল দেওয়া হয়, শরীর দাহের পর অস্থি বিসর্জন দেওয়া হয় গঙ্গাগর্ভে।

এ হেন গঙ্গাকে কলকাতার পাশে দাঁড়িয়ে দেখলে বলতে ইচ্ছে হয়, 'কেন গো মা তোর রুক্ষ নয়ন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ'? কলকাতায় যে-কটি দর্শনীয় স্থানের নাম লোকে বলে থাকে, তার মধ্যে গঙ্গার নাম নেই। কেতাবে পড়েছি এবং লোকমুখে শুনেছি প্যারিসের নদীর পাড়ে সন্ধ্যেবেলা কোনো গম্ভীর, জ্যাঠামশায়শ্রেণীর লোক হাঁটে না, ওসময়ে ও অঞ্চল প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। কলকাতায় প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য কোনো বিচরণভূমি নেই, লেকে ভিড়, ময়দানে পুলিস, রেস্টুরেন্টে উঁকিঝুঁকির দৌরাত্ম্য, কিন্তু কেউ নদীর পারে যায় না। কলকাতার বহু নাগরিক হয়ত বৎসরে একবারও গঙ্গা দর্শন করে না। দক্ষিণ কলকাতার একটি ষোড়শী বালিকার মুখে আমি শুনেছি যে সে একবারও গঙ্গা দেখেনি, শুধু রাত্রিবেলা হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে দু-একবার গাড়ি করে চলে যাবার সময় ছাড়া। যদিও গ্রামাঞ্চল থেকে প্রতিদিন বহু লোক আসে শুধু একবার গঙ্গাস্নান করবার জন্য। নদীঅন্তপ্রাণ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কত নদীকে স্বনামধন্য করেছেন, বুকের উৎসে জন্ম দিয়েছিলেন কত নদী, তিনিও কলকাতার গঙ্গা নিয়ে বোধহয় বিশেষ কিছু লেখেননি।

এখানে আমি নদীর চরিত্র নিয়ে কিছু বলতে চাই। নদী কোনোদিনও সরল হয় না। সব নদীই তির্যক, মত্ত, কুটিল, লোভী। একই সঙ্গে শান্ত এবং তরঙ্গময়, উদাসীন এবং হিংসুক। নদীকে যদি প্রেমিক বলি—তবে এমন আদর্শ প্রেম আর হয় না। নদী যাকে ভালোবাসে তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেয়। পদ্মার আরেক নাম কীর্তিনাশা। শুধু পদ্মা নয়, সব নদীই কীর্তিনাশা।

নদীগুলি তাদের পূর্ব গৌরব হারাচ্ছে—তার কারণ নদীপথ এখন বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। মানুষের প্রেম থেকে প্রকৃতি-প্রেম মুছে যাচ্ছে—মানুষ হয়ে উঠছে প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি কবিতায় লিখেছিলেন, নদীর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে দু জাতের মানুষ। কেউ কেউ নদীর দিকে তাকিয়ে উদাস হয়, তাদের বুকে গভীর বাঁশী বাজে, কবিত্বের রুদ্ধ যন্ত্রণা মুহুর্মুহু তাদের আঘাত করে। আরেকদল নদীর পারে দাঁড়িয়ে অঙ্ক কষে, কি করে ব্রীজ বানাবে, কি করে বাঁধ বেঁধে জব্দ করবে, উদ্দাম বন্যা নদীকে। দ্বিতীয় দলের মানুষই আজ বেশী। তাই পৃথিবীর সব নদীই নির্জীব, মৃতকল্প। কলকাতার গঙ্গার একপাশে হাওড়া ব্রীজ, আরেক পাশে বালি ব্রীজ। একটি তাঁর উপরের আকাশ ঢেকেছে, অন্যটি তাঁর বুকে স্ক্রু চালিয়েছে।

কিন্তু একসময় এই গঙ্গার গৌরব ছিলো। কলাকাতার অনেক উৎসবে ব্যসনে, প্রমোদে গঙ্গার স্থান ছিলো অপরিহার্য। বড় বড় বাবুদের নৌকা-বিলাস, বাঈনাচ, খুনজখমের খেলা হত এখানে। ঈশ্বরগুপ্তের পদ্যে, হুতোমপ্যাঁচার নক্সায় তার বর্ণনা আছে। অনেকগুলি ঘাটও বসিয়ে দিয়েছিলেন সে-কালের অনেক খ্যাতিমান ধনী।

দর্শনীয় স্থান হিসেবে গঙ্গাতীরের তেমন আকর্ষণ নেই—তার কারণ এখানে বসবার মতো মাটি ঘাস নেই; আবার সুন্দর করে বাঁধানোও নয়। বড় এবড়ো-খেবড়ো, নোংরা। পাশে সরু একটু রাস্তা, তার পাশেই কর্কশ রেললাইন। বসবার জন্য সিমেন্টের বেঞ্চ বানিয়ে দিয়েছে পোর্ট কমিশন, কিন্তু সেখানে বসে অনবরত গোগ্রাসে বায়ু ভোজন করে ডিস্-পিপ্‌টিক বৃদ্ধের দল। নদীর পারে ঘাসে পা ঝুলিয়ে না বসলে ঠিক রোমাঞ্চ হয় না। ছেলেবেলা আমরা গ্রামের নদের পারে বসতুম, সে নদ বড় ভয়ঙ্কর, তার নাম আড়িয়াল খাঁ। আজ যেখানে বসে থাকতুম কাল হয়তো তার একশো হাত দূর পর্যন্ত বিশাল ফাটল, পরশু সেখানে আবার অতি শান্ত জলরাশি। পৌর-কর্তৃপক্ষের যদি দৃষ্টি পড়তো কলকাতার গঙ্গার দিকে, যদি কৃত্রিম ব্যবস্থা করা হতো ভ্রমণের, যদি স্টেট ট্রান্সপোর্ট নিয়মিত স্টিমার কিংবা লঞ্চ সার্ভিসের ব্যবস্থা করতো, তবে হয়তো নদীর

প্রতি দৃষ্টি পড়তো মানুষের। হয়তো অন্ধকার আকাশের নিচে স্টিমারের ডেকে রেলিঙ-এ ভর দিয়ে দাঁড়ানো কিছু যুবক-যুবতীর সুস্থ নিঃশ্বাস শুনতে পাওয়া যেতো।

তবু কলকাতার সমীপে ভাগীরথীর বর্তমানে যে দৃশ্য সে দৃশ্য হয়তো লোককে ডেকে দেখাবার মতো নয়, কিন্তু নিজের দেখবার মতো। বর্ণনা দেবার বিশেষ কিছু নেই কিন্তু একা দাঁড়িয়ে দেখলে দৃশ্যের শেষ নেই। কলকাতার বুকে আধুনিকতম পৃথিবীর চিহ্ন, পাশের নদীতীরে ট্র্যাডিশনাল ভারতবর্ষ। ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে মধ্যযাম পর্যন্ত অবিরাম চলেছে গঙ্গাস্নান, নদীবক্ষে দাঁড়িয়ে কেউ করছে সূর্যবন্দনা, কেউ করছে পরনিন্দা-চর্চা। সর্বাঙ্গে মাটি মেখে তৃপ্তির সঙ্গে অবগাহন করছে কেউ। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে একটি সুন্দর তুলনা দিয়েছিলেন। একজন ইউরোপীয় বৎসরে একবারও স্নান করে না, সারাদিন ঘর্মাক্ত পরিশ্রম করে সন্ধ্যেবেলা শরীরের ময়লা শরীরে রেখে আলতোভাবে মুখ হাত ধুয়ে তারপর বহুমূল্য চকচকে পোশাক-প্রসাধন করে সান্ধ্যবিলাসে বের হয়। আর একজন ভারতীয় মজুর সন্ধ্যেবেলা এসে দেড়ঘণ্টা তেল মাখে, আধঘণ্টা মাটি দিয়ে শরীর ঘষে স্নান করে—তারপর উঠে এসে আবার সেই ময়লা চিটচিটে জামাকাপড় পরে। সন্ধ্যেবেলা এখানে বটের ঝুরিতে অন্ধকার জমে থাকে, দূরে দেখা যায় হাওড়া ব্রীজের লাল আলো, নৌকোগুলি মুছে গিয়ে ঢেউ-এ দোলে লণ্ঠনের আলো, মাঝে মাঝে শোনা যায় স্টিমারের শান্ত উদাস ডাক।

কিছুদিন অন্তর অন্তর অমাবস্যা পূর্ণিমায় আসে, চাঁদের ভালবাসার টান। পৃথিবীর জলকে টানে। তখন জোয়ার আসে গঙ্গায়, তাকে বলে বান। ঘণ্টা বেজে ওঠে, নৌকোগুলি দড়ি খুলে দেয়, চারদিকে উত্তেজনা, পারে একটা লোক থাকলেই মারা পড়বে, শুধু অতি সাহসী সাঁতারুরা বানের জলে ঝাঁপ মারে। বান শেষ হলে জেটির মুখটা উচু হয়ে থাকে, দূর থেকে দেখায় একটা বিশাল হাঙরের মতো। শ্মশানে দিবারাত্র আগুন, তার আশেপাশে চণ্ডাল-সন্ত-সন্ন্যাসী। কিন্তু থাক, আমি শ্মশানের কথা বলবো না।

কলকাতার গঙ্গার ডাক-নাম হুগলী নদী। বাংলা সাহিত্যে এই হুগলী নদীর দান অবিস্মরণীয়। সাধুভাষা ছেড়ে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে গদ্য ভাষাকে স্ট্যাণ্ডার্ড বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, সে ভাষা হুগলী নদীর তীরবর্তী মানুষের মৌখিক ভাষা। সেই গাঙ্গেয় ভাষা সমস্ত বাংলা দেশের কথ্য ভাষা নয়, কিন্তু সাহিত্যের ভাষা।

## বই চুরি

আমি আর ইন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই বই চুরির অভিযানে বেরুতাম। রাতের অন্ধকারে নয়, প্রকাশ্যে দিনের বেলায়। এ ব্যাপারে ইন্দ্রনাথই নায়ক, আমি তার চেলা মাত্র।

বই চুরির ব্যাপারে ইন্দ্রনাথের কোনরকম গ্লানি নেই। ও বলে, মাঠের মধ্যে কাঁটাঝোপ থেকে তুমি যদি একটা মুক্তো কুড়িয়ে পাও, তারপর সেটা যদি কোনো সুন্দরী মেয়ের গলায় ঝুলিয়ে দাও, সেটাকে কি চুরি করা বলবে? তেমনি কোনো মূর্খ লোকের উইধরা আলমারি থেকে দুর্লভ বইগুলো কোনো খাঁটি লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়াও চুরি নয়।

আমরা অভিযানে যেতাম প্রাক্তন জমিদার বা বনেদী বড়লোকদের বাড়ি, যেখানে এক সময়ে লেখাপড়ার চর্চা ছিলো অথবা আলমারি সাজাবার জন্য ভালো ভালো বই কেনা হয়েছিলো—এখনকার বংশধররা আর বইপত্র নিয়ে মাথাই ঘামায় না। অযত্নে অবহেলায় এই রকম কত অমূল্য বই নষ্ট হয়ে যায়।

কোনো বাড়িতে পুরনো বইয়ের সংগ্রহের খবর পেলে আমরা অবশ্য প্রথমে কিনে নেবারই চেষ্টা করি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই টাকার বিনিময়েও বই পাওয়া যায় না। বনেদী বাড়িগুলিতে সাধারণত হাজার রকমের মামলা মোকদ্দমা লেগে থাকে, কে কোন্ সম্পত্তিটুকুর উত্তরাধিকারী তার নিষ্পত্তি হয় না। লাইব্রেরির চাবি কার কাছে আছে বা

কে খুলছে তার ঠিক নেই। অনেক বাড়িতে দেখেছি লাইব্রেরি ঘর দশ-বারো বছরের মধ্যে খোলাই হয়নি! সে সব ক্ষেত্রে চুরি করা ছাড়া আর উপায় কি?

মুর্শিদাবাদ জেলায় ঘুরতে ঘুরতে ইন্দ্রনাথ হঠাৎ বললো, চলো, এবার আমরা একটা চোরের বাড়ি যাবো। আমি হেসে ফেললাম। আমরা নিজেরাই চোর, আবার কোন্ চোরের কাছে যাবো?

ইন্দ্রনাথ বললো, এ একেবারে পাকা চোর! আমি বললাম, খিদে পেয়েছে, এখন ভাই কোন চোর-টোরের বাড়ি যাবো না! আগে খেয়ে নিই কোনো হোটেলে। ইন্দ্রনাথ বললো, চলোই না, ওর বাড়িতে খাবো। ও খাঁটি মোগলাই খানা খাওয়াবে!

চোর খাওয়াবে মোগলাই খানা? তা হলে চোর না বলে তো একে ডাকাত বলাই উচিত। কিংবা···।

—নাম কি চোরটার?

—লটপট সিং!

আমি ভাবলাম, ইন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। দুপুর রোদ্দুরে এসব ইয়ারকি ভালো লাগে না।

জায়াগাটার নাম আজিমগঞ্জ। এখানকার হোটেলে একবার দারুণ চিতল মাছের পেটি দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম, মনে আছে। সেই লোভ স্মরণ করে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে যেতেই হলো।

একটি বিশাল প্রাসাদ, কিন্তু তার এমনই অবস্থা যে যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। সেই বাড়ির একতলার দুটি ঘরে থাকে লোকটি। রোগা, লম্বা চেহারা, মুখখানা পাকা ফুটির মতন, এককালে বেশ ফর্সাই ছিল বোঝা যায়। লোকটির চেহারার সঙ্গে লটপট সিং নামটাও বেশ মানিয়ে যায়। কিন্তু ওর আসল নাম লজপত সিং। লোকটি জাতিতে রাজপুত। নবাবী আমলে ভাগ্যান্বেষণে দূর দূর থেকে অনেক সিপাহী এসেছিলো মুর্শিদাবাদে, তাদের বেশ কিছু বংশধর এখানে রয়ে গেছে। এরা মাছ ভাত খায় এবং বাংলা ছাড়া আর কোনো ভাষাই জানে না।

ইন্দ্রনাথকে দেখে লজপত সিং মস্ত বড় জিভ কেটে বললো, এই যে আপনি এসেছেন? আপনাকে দেখেই যে লজ্জা পাচ্ছি স্যার!

ইন্দ্রনাথ কঠোরভাবে বললো, সেই জিনিসটা এখনো যোগাড় হয়নি?

লটপট সিং বললো, না স্যার, কিছুতেই পারলাম না। আপনি এত দূর থেকে এসেছেন গরীবের বাড়িতে, অন্য যা জিনিস আছে দেখুন, সস্তা দামে দেবো—

আস্তে আস্তে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হলো। লজপত সিংকে চোরদের এজেন্ট বলা যেতে পারে। লজপত সিং বিভিন্ন বনেদী বাড়ি থেকে নানান ছল ছুতোয় কিংবা সরাসরি চুরি করে দুর্লভ জিনিস সংগ্রহ করে। তারপর সেগুলি বিক্রি করে শহরের ব্যবসায়ীদের কাছে। অনেক সময় ইন্দ্রনাথের মতন কেউ ওকে সন্ধান দেয়, কোনো বাড়িতে সেরকম কোনো লোভনীয় বই বা অন্য কিছু আছে। লজপত সিং সে-গুলো যোগাড় করে আনে। একদা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী রাজপুতের পক্ষে বেশ ভালো পেশাই বটে।

লজপত সিংয়ের কাছে যেসব বই, পুথি ও হাতির দাঁতের জিনিসপত্র আছে, তার একটাও ইন্দ্রনাথের পছন্দ হলো না। ওর প্রয়োজন অন্য। এখানকার এক প্রাক্তন জমিদার-বাড়িতে মোগল ও কাংড়া পেইন্টিংসের একটি অতি দুর্লভ বাঁধানো অ্যালবাম আছে। সেটি উইপোকার হাতে একেবারে ধ্বংস হতে চলেছে। সেই জমিদারের উত্তরাধিকারীরা অত্যন্ত মুর্খ, ছবি কিংবা সাহিত্য কিছুই বোঝে না, তারা এখন কলকাতার রাজা-বাজারে বিড়ি-পাতার ব্যবসা করে। মামলা মোকদ্দমার জন্য ওদের গ্রামের বাড়ি দীর্ঘকাল তালাবন্ধ। সেখানে যে সব বই বা ছবি আছে সেগুলো উদ্ধার করতে না পারলে একদম নষ্ট হয়ে যাবে অচিরেই। ইন্দ্রনাথ সত্যিই শিল্পপ্রেমিক, সে রাগে ফুলতে লাগলো।

মোগলাই খানা জুটলো না বটে, কিন্তু লজপত সিং আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলো খুব তাড়াতাড়ি। ভাত, ছোলার ডাল আর পার্শে মাছের ঝোল, আর দোকান থেকে কিনে আনা টক দই। খাওয়াটা

মন্দ হল না।

খেতে খেতে লজপত সিং বললো, স্যার, আপনার ঐ জিনিসটা যোগাড় করার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিছুতেই পারলাম না এক ব্যাটা উজবুকের জন্য! দুটো দারোয়ান আর একটা নোকর ঐ বাড়ি পাহারা দেয়। দারোয়ান দুটোকে হাত করেছিলাম, কিন্তু নোকরটাকে কিছুতেই কিছু বোঝানো যায় না। ঐ ব্যাটার কাছেই লাইব্রেরি-ঘরের চাবি।

ইন্দ্রনাথ বললো, কে, সেই ইরফান আলি তো?

—হ্যাঁ, স্যার।

ইন্দ্রনাথ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, সে লোকটিকে আমি চিনি। ভীষণ বুড়ো। আশি পঁচাশি বছর বয়েস হবে। ছোট্ট বয়েস থেকে ঐ চৌধুরীদের বাড়ি কাজ করছে। এককালে ও বাড়ির অনেক রবরবা দেখেছে। এখন সেখানে কিছুই নেই, তবু লোকটা প্রভুভক্তি আঁকড়ে রেখেছে।

তারপর ইন্দ্রনাথ লজপত সিংকে বললো, আমিও তো সেই ইরফান আলির সঙ্গে দু-তিন বার দেখা করেছিলাম, আমি তাকে ভজাতে পারিনি, তাই তো তোমার ওপর ভার দিয়েছিলাম।

লজপত সিং বললো, কী করবো স্যার, তাকে কিছুতেই বাঁকানো যায় না। মনিবের হুকুম ছাড়া সে কিছুতেই ঘর খুলবে না। এখন কে যে তার মনিব তারই ঠিক নেই। মামলা শেষ হতে হতে হয়তো পুরো বাড়িটাই ভেঙে পড়বে—তবু লোকটা কিছুতেই বুঝবে না।

—ওকে টাকার লোভ দেখাওনি?

—পাঁচশো টাকা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলাম। তবু বোকারামটা রাজি হলো না। লোকটা দেড় বছর ধরে মাইনে পায় না, ঘরে খাবার নেই, তবু তার মনিবের ভয়।

ইন্দ্রনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

লজপত সিং বললো, এই আজিমগঞ্জেই লোকটার বাড়ি। একবার গিয়ে শেষ চেষ্টা করবেন নাকি? দুপুরে বাড়িতে খেতে আসে।

—চলুন। এক্ষুণি চলুন।

ইরফান আলির বাড়ি নদীর ধারে। মাটির ঘরের ওপরে খড়ের চালা, ঘরটা একদিকে হেলে গেছে। তার প্রভুদের প্রাসাদের মতন ইরফান আলির নিজের ঘরও পড়ো-পড়ো। বাইরে থেকে কয়েকবার ডেকেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আমরা দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। ভেতরে একটা ক্ষীণ গোঙানির শব্দ। একটু ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেলো। ভেতরের দৃশ্য দেখে থমকে গেলাম।

সারা ঘরে একটি মাত্র খাটিয়া ছাড়া কোনো আসবাব নেই। সেই খাটিয়ায় পাশ ফিরে শুয়ে একটি বৃদ্ধ বমি করছে। ঘরের মেঝেটা ভাসছে বমিতে। একটা বিশ্রী গন্ধ।

লজপত সিং বললো, ঐ তো ইরফান আলি!

সে আর ঘরের মধ্যে ঢুকতে চাইলো না। গন্ধের জন্য নাকে কাপড় চাপা দিলো। ইন্দ্রনাথ এগিয়ে খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো, মিঞা সাহেব, আপনার কি হয়েছে?

ইরফান আলি চোখ মেলে তাকালো এবং উঠেবসার চেষ্টা করলো। ইন্দ্রনাথ বাধা দিয়ে বললো, থাক, থাক।

ঘরটার নোংরা অবস্থার জন্য ইরফান আলির মুখে একটা লজ্জার ভাব ফুটে উঠলো। তারপর দু'দিকে মাথা নেড়ে জানালো, তার কিছুই হয়নি।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলো, আপনার বাড়িতে আর কোনো লোকজন নেই?

বৃদ্ধ এবারেও দু'দিকে মাথা নাড়লো।

ইন্দ্রনাথ বললো, আপনার বোধহয় কলেরা হয়েছে মনে হচ্ছে। ডাক্তার কবিরাজ ডাকেননি?

বৃদ্ধ এবার শুধু হাসলো।

লজপত সিং বললো, দেড়-দুই বছর মাইনে পায় না। খায় কিনা সন্দেহ। ডাক্তার ডাকবে কোথা থেকে?

ইন্দ্রনাথ বৃদ্ধকে বললো, আপনি কি পাগল? মনিবরা আপনাকে

মাইনে দেয় না। তবু আপনি আমাদের কথা শুনলেন না! একটা শুধু কেতাব চেয়েছিলাম তার বদলে আপনি পাঁচশো টাকা পেতেন। আপনাকে এখনো আমরা হাজার টাকা দিতে পারি।

বৃদ্ধ কম্পিত হাত দুটি তুলে জোড় করে বললো, আমায় মাফ করবেন। আপনি আগেও এসেছিলেন। আপনার কথা রাখতে পারলাম না, এজন্য আমার মনে বড় দুঃখ। কিন্তু ছোট বয়েস থেকে মনিবের নুন খেয়েছি। তেনাদের হুকুম না পেলে ঘর খুলিনি কখনো। আর বোধ হয় বাঁচবো না। কাল একজনের হাত দিয়ে চাবি পাঠিয়ে দিয়েছি কলকাতায়। এ পর্যন্ত কোনো গুনাহ্ করিনি। শেষের বেলাটায় কেন আর ওসব করি। আমারে মাফ করবেন!

লোকটির সততার কাছে আমরা তিন চোর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বহুকাল মাইনে পায় না, খেতে পায় না, রোগে ভুগে ভুগে মৃত্যুশয্যায় এসে পৌঁছেছে—তবু ওর টাকার লোভ নেই। এক হাজার টাকার কথা শুনেও একটুও বিচলিত হলো না। ও কোনো দোষ করেনি তবু আমাদের কাছে ক্ষমা চাইছে।

ইন্দ্রনাথ লাফিয়ে উঠে বললো, এক্ষুণি ডাক্তার ডাকতে হবে। বাঁচাতেই হবে এই লোকটাকে। চলো শীগগির—একটা বই বা ছবির চেয়ে একজন মানুষের জীবনের দাম অনেক বেশী। ইন্দ্রনাথ তা জানে। সে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

## হাওড়া স্টেশন

নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে একটা হাত হারিয়েছিলেন যে হার্ডিঞ্জ—তিনিই একসময় ভারতবর্ষে রেল বসাবার পরিকল্পনা করেন। তার মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিলো যে ঘোড়াই হচ্ছে গতিশক্তির চূড়ান্ত প্রতীক, তার চেয়ে দ্রুত আর কেউ কোনোদিন ছুটতে পারবে না। কিন্তু রোজ সকালে

আমাদের রান্নাঘরে চায়ের কেটলির ঢাকনা ঠেলে যে বাষ্প, সে-ই হারিয়ে দিলো ঘোড়াকে। ঘোড়ার হাজার হাজার বছরের সুনাম নষ্ট হলো। কিন্তু যে ঘোড়ার দুটো ডানা আছে, রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে যে শূন্যপথে উড়িয়ে নিয়ে যায়, আমাদের মনের মধ্যে তাকে কেউ কোনোদিন হারাতে পারবে না।

হার্ডিঞ্জের পর ডালহাউসি এসে সত্যিকারের লোহার লাইন পাতলেন এদেশে। সভ্যতার নতুন পথ কাটা হলো। সেসব মাত্র একশো বছর আগের কথা। কে আর সে কথা মনে রাখে। এই সেদিন ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন দেখতে গিয়ে যারা নিজেদের মাথা ফাটাল, তারা এ-কথা মনে রাখেনি। একটি নির্লিপ্ত বিরাট পুরুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে হাওড়া স্টেশন।

আগেকার দিনে অনেক নগর ঘেরা থাকত প্রাচীর দিয়ে। মাঝে মাঝে থাকত প্রবেশ-দ্বার। গঙ্গা আর মারহাট্টা ডিচ দিয়ে ঘেরা এই কলকাতার দুই দ্বার—হাওড়া স্টেশন আর শিয়ালদহ স্টেশন। কিন্তু শিয়ালদহ যেন অনেকটা অন্দর-মহলের পথ। হাওড়া স্টেশর্ন সিংহদ্বার।

একদা একটি পূর্ববঙ্গীয় বালক—যে কলকাতায় এসেছে বিশাল পদ্মা পার হয়ে, প্রথম দেখতে গিয়েছিল হাওড়া স্টেশন। তখন দুদিক খোলা ব্রীজের বদলে সদ্য তৈরী হয়েছে নতুন হাওড়া ব্রীজ। ছেলেটির বাবা সেদিন ছুটির শেষে ফিরে যাবেন তাঁর নতুন কর্মস্থল সুদূর দিল্লিতে, একা; মা-দাদা-দিদিদের সঙ্গে ছোট ছেলেটি এসেছিল বাবাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে, খুব ভোরে ট্যাক্সিতে গঙ্গা পার হবার সময় কুয়াশায় ঢাকা হাওড়া ব্রীজকে মনে হয়েছিল সূর্যের প্রতিদ্বন্দ্বী স্পর্ধিত বিন্ধ্য পর্বত, আর একটু দূরে হাওড়া স্টেশনকে মনে হয়েছিল মহামহিম অগস্ত্য ঋষি—যার উদরে এক অজানা সমুদ্র। স্টেশনের মধ্যে ছেলেটি ঢুকেছিল একটু ভয়ে ভয়ে। ইলেক্‌ট্রিকের আলো, অন্ধকার আর সদ্যস্ফুট সূর্যের লাল আভা মিশে একটা অদ্ভুত রহস্যময়তা চারদিকে। সকলেই ছুটছে, কথা বলছে, কিন্তু কেমন যেন বিষণ্ণ ভাব। চারদিকে বিদেশী গন্ধ। বাবা কামরায় উঠে বসলেন ঠিকঠাক

হয়ে, বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে নিচে নেমে ছেলেটি আইসক্রীম খেতে লাগলো। তারপর একসময় ট্রেন ছাড়লো, রুমাল নাড়তে লাগলো সকলে, আর হঠাৎ ছেলেটির বুকের মধ্যে একটা আশ্চর্য ব্যথা মুচড়ে উঠলো। মায়ের হাত ছাড়িয়ে সে ছুটে যেতে চাইলো ট্রেনের দিকে, চিৎকার করে বলতে চাইলো, বাবা, তুমি যেও না, যেও না, কিংবা আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও! কিন্তু কিছুই হলো না, ট্রেন চলে গেলো—মিলিয়ে গেলো গার্ডের ঘরের শেষ আলো। সেদিন ফেরার পথে ছেলেটি ভারী মধুর এক দুঃখ নিয়ে ফিরেছিলো।

এমন দুঃখিত মুখ রোজ দেখা যায় হাওড়া স্টেশনে। আবার অজস্র সুখী মুখও ঝলমল করে চারদিকে। দীর্ঘদিন প্রবাসের পর ফিরছে কত প্রিয়জন, ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে উৎকণ্ঠিত স্বজন বান্ধবেরা। হয়তো বাপ-মায়ের সবে-ধন নীলমণি ফিরছে বিলেত থেকে—স্টেশনে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। বন্ধুর তিন বছর আগের বাসী বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নেবার জন্য ঘন ঘন ক্যামেরায় বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে, রজনীগন্ধার ছড়াছড়ি—আর নীলমণিটি মাছের চোখের মতো ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সকলের দিকে—হঠাৎ স্মার্ট হয়ে বিলেতিয়ানা ঢাকবার চেষ্টায় খাঁটি পূর্ববঙ্গের ভাষায় কথা আরম্ভ করছে। কোনোদিকে বা দেওঘর কিংবা দীঘা থেকে এক্সকারশন শেষ করে ফিরছে মেয়েস্কুলের পঞ্চাশটি ছোট্ট রঙিন প্রজাপতি। একদিনের ট্রেন-জার্নিতেই অনেকের সুকুমার মুখ ঝরাফুলের মতো শুকিয়ে এসেছে। আর ঐ যে সেই বুভুক্ষু ইঁদুরের মতো শীর্ণ এবং লোটা-কম্বল-সম্বল লোকটি যে একদিন এখান থেকে ফিরবে চতুর্গুণ শরীর এবং পুরো ট্রেন রিজার্ভ করবার মতো জিনিস নিয়ে।

এখানে দাঁড়ালেই 'মহামানবের সাগরতীরে' কথাটার মানে বোঝা যায়। কোন জাত নেই? কাবুল-পেশোয়ার থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সব অঞ্চলের মানুষ দেখা যাবে এখানে, এই হাওড়া স্টেশনে। বিদেশীরও অভাব নেই। সকলেই এক স্রোতে বেরিয়ে আসে, ছড়িয়ে যায় প্ল্যাটফর্মগুলির বাইরের বিশাল মণ্ডপে—যার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখা যায় না। ট্রেনের মধ্যে যারা নতুন বন্ধু হয়েছে,

এখানে পরস্পরে হাত ছুঁয়ে বিদায় নেয়। আর হয়তো সারা জীবনে দেখা হবে না। বাইরে বেরিয়ে এসে সকলে একবার স্টেশনের ঘড়িটার দিকে তাকায়। প্রতীক্ষায় আছে বাস্, ট্রাম, ট্যাক্সি, ফিটন, রিকশা। এত বিচিত্র এবং অজস্র যানবাহনের ব্যবস্থা ভারতবর্ষের আর খুব কম স্টেশনেই আছে।

ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে ডেলিপ্যাসেঞ্জাররা সবচেয়ে বেপরোয়া। তারা ট্রেনকে ভালবাসে না, স্টেশনকে গ্রাহ্য করে না; তারা ছুটে এসে ট্রেনে ওঠে, ছুটে নেমে যায়। তারা গাড়িতে তাস খেলে বা কাগজ পড়ে, কোথাও ট্রেন থামলে চোখ বুজে স্টেশনের নাম বলে দেয়। সবচেয়ে কুলীন যাত্রী তারা, যারা ভ্রমণে যায়। তারা সাধারণত রাত্রির গাড়ি বেছে নেয়, আসে সময়ের এক ঘণ্টা আগে, গলার ভাঁজে ভাঁজে পাউডার লেগে থাকে, যার সঙ্গেই দেখা হয় আকর্ণবিস্তৃত হেসে গন্তব্যস্থানের বর্ণনা দেয়। তারা এন্‌কোয়ারি অফিসে যায়, জলের কল থেকে বোতলে জল ভরে, বিজ্ঞাপন পড়ে, টাইম টেব্‌ল কেনে।

কলকাতা ছেড়ে যাবার সময় বিশেষ কোনো অনুভূতি হয় না। কিন্তু কোথাও অনেকদিন কাটাবার পর কলকাতায় ফিরতে বুকটা মুচড়ে ওঠে, মনে হয় কেন আমি এতদিন এই প্রেয়সী নগরীকে ছেড়ে ছিলাম। ট্রেন যতই হাওড়ার কাছে আসে, আসন্ন প্রিয় সম্মিলনের মতো বুক তুরুতুরু করে, দূর থেকে রুপোলী রঙ-এর স্টেশনকে দেখে অবর্ণনীয় আনন্দ হয়।

স্টেশন থেকে বাইরে এলে গঙ্গা এক ঝলক বাতাস পাঠিয়ে দেয়। তখন আর হাওড়া ব্রীজকে স্পর্ধিত বিন্ধ্যপর্বত বলে মনে হয় না। মনে হয় যেন কলকাতা আমার দিকে যুক্ত কর বাড়িয়ে দিয়েছে, শান্ত গলায় বলছে, এতদিন কোথায় ছিলেন ?

# কলকাতার দেওয়াল লিপি

কলকাতার ললাট কখনও প্রসন্ন নীল, কখনও মেঘ-বিষণ্ণ, কখনও বা চিন্তাকুটিল, রোষ-কঠিন। স্ত্রীলোকের চরিত্র কিংবা পুরুষের ভাগ্যের মতোই কলকাতার ললাট-লিপি দুর্বোধ্য।

কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে অসংখ্য লেখা এবং ছবি। সতত পরিবর্তনশীল বলেই সেগুলি রোমাঞ্চকর এবং চিত্তাকর্ষক। ছেলেবেলায় ইস্কুল যাবার পথে দেখতাম পথের মোড়ে বিশাল চেহারার মহাদেব মূর্তি। দৈর্ঘ্যে প্রায় দুজন মানুষের সমান, জটাজুট, বাঘছাল, সাপটাপ সবশুদ্ধ। পরিপুষ্ট ভুঁড়ি, মুখে মিটিমিটি হাসি, একটা হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। পায়ের কাছে ছোট্ট খুকীর মতো অন্নপূর্ণা। একটা ঘি কোম্পানীর বিজ্ঞাপন তিনতলা বাড়ির এক দিকের সম্পূর্ণ দেওয়াল জুড়ে।

আমরা জানতুম, দেবাদিদেব মহাদেব অক্ষয় অমর। কিন্তু আমরা ইস্কুলের নতুন ক্লাসে উঠবার আগেই মহাদেবের মৃত্যু হলো। জটাজুট ছেঁটে হালফ্যসানের চুল, শৌখিন, গোঁফ, প্যাণ্ট-কোট-পরা জনপ্রিয় চিত্রতারকা এলো সেখানে—তার পাশে বিশাল বেঢপ চেহারার নায়িকা, এবং বাংলা সিনেমার ফুল লতা পাতা চাঁদ ইত্যাদি। এখন সেখানে 'বাত ও বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ'। হাড়-জিরজিরে ত্রিভঙ্গ এক গাল-ফোলা বুড়োর ছবি।

দেওয়ালে সিনেমা থিয়েটারের পোস্টারগুলিই প্রধান এবং বেশি জায়গা জুড়ে থাকে। থিয়েটারের বিজ্ঞাপনগুলি বিরাট, কাঠের ব্লকে ছাপা, গম্ভীর রং। চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনগুলি সব জুড়লেই একটা চলচ্চিত্র হয়ে যায়। এত হরেক রঙ আর ছবি। আজকাল বিজ্ঞাপনের অনেক কায়দা বেড়েছে—আগেকার সেই 'আসিতেছে! আসিতেছে!! আসিতেছে!!!' কিংবা 'অভূতপূর্ব রোমহর্ষক' কিংবা 'বিলম্বে হতাশ

হইবেন' কিংবা 'এক টিকিটে হাজার মজা' কিংবা 'যাঁহারা অমুক তারিখের টিকিট কাটিবেন তাঁহারা বিনামূল্যে একটি হাতপাখা উপহার পাইবেন' কিংবা 'সঙ্গীতপটিয়সী অমুকবালার এই ভূমিকায় প্রথম অবতরণ' ইত্যাদি ভাষা আর দেখা যায় না। তার বদলে ভঙ্গিমায় রূপসীদের ছবি, পটলচেহারার নায়কদের হাস্যকর গাম্ভীর্য—সেই সঙ্গে জীবন, প্রেম, যুগ সম্বন্ধে গণ্ডপূর্ণ বাণী। কোনো বিজ্ঞাপনে এখন ফ্লুরোসেন্ট রং—যা বহুদূর থেকে চোখে পড়ে। কাঁধে মই—হাতে আঠার বালতি এবং পোস্টার—একজাতীয় লোক এইগুলি দেওয়ালে দেওয়ালে লাগিয়ে যায়। এদের রসবোধ প্রচুর। এক পোস্টারের পাশে—নিচে—উপরে আরেক পোস্টার লেগে অনেক সময় বিচিত্র রহস্য তৈরী হয়। এক ভদ্রলোক তো কয়েকটি পোস্টার পাশাপাশি দেখে শরৎ-সাহিত্যের এক বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কোনো একদিন তিনি শহরের দেওয়ালে দেখলেন বেশ বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'তাইতো', 'বিপ্রদাস', 'কাশীনাথ', 'বিন্দুর ছেলে' ? এ প্রশ্নের জবাব কি ? অনেক শুভ সংবাদও পাওয়া যায় দেওয়াল থেকে ঃ

বামুনের মেয়ে — সখের চোর
শুভ বিবাহ !

সব জায়গায় এমন নিটোল খবর পাওয়া না গেলেও অনেক উল্টো-পাল্টা প্রলাপ বাক্য দেখতে পাওয়া যায়। তার নমুনা দিয়ে লাভ নেই—যে কেউ চোখ মেললেই দেখতে পাবেন। অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের কম্পোজিশনও চোখে পড়ে। পিস্তল তুলে দাঁড়িয়ে আছে হীরো, তিনটে দুর্বৃত্ত মরে পড়ে আছে—তার ঠিক পাশেই নির্ভয় লাস্যময়ী তরুণী গোলাপফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে অন্যমনস্কভাবে। মাঝে মাঝে আবার এসব বিজ্ঞান সজীব হয়ে হাত-পা নীড়ে—তখন আরও ভয়ংকর, কুৎসিত দেখায়।

সিনেমা থিয়েটারের পরই সভা-সমিতির বিজ্ঞাপন। প্রতিদিনই শহরের কোথাও না কোথাও জনসভা আছেই কলকাতায়। অমুক তারিখ অমুক জায়গায় 'বিশাল' কিংবা 'মহতী' জনসভা। এই সব

সভাসমিতির বার্তায় সব সময়ই একটি হিউমার থাকে। কোথাও শুধু সভা হয় না, মহতী কিংবা বিরাট সভা। অর্থাৎ সভা হবার আগেই তাঁরা জনসংখ্যা চোখে দেখতে পান। এ ছাড়া খুচরো জিনিসের যে সব বিজ্ঞাপন আছে—সেগুলি সাধারণত ক্রমশ প্রকাশ্য ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতো রহস্যময় করার চেষ্টা হয়। কলকাতা শহরের রাজপথের উপর কোনো ফর্সা দেওয়াল পর্যন্ত দেখিনি।

কাজে হয়তো আপনি যাচ্ছেন—চোখে পড়লো, 'আপনার কি হাঁপানি হয়েছে?' 'মাথাধরায় কষ্ট পাচ্ছেন কি?' 'আপনার যদি সর্বাঙ্গে বেদনা এবং জ্বরজ্বর বোধ হয়—' এসব পড়লে তো এমনিতেই জ্বর আসে, মাথা ঘোরে। মানুষের ইন্দ্রিয় যদি এমন হতো যে কোনো কোনো সময়ে বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ পড়লেও— না পড়ে থাকা যেতো!

বিদেশ থেকে ভোরবেলায় ট্রেনে একবার কলকাতায় ফিরেছিলুম ছেলেবেলায়। পথেঘাটে অস্পষ্ট কুয়াশা, রাত্রি জাগরণে স্তিমিত চক্ষু আমার। সেদিন এক ভাঙা বাড়ির দেওয়ালে সাদা অক্ষরে আমি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপনটি দেখেছিলাম ঃ

হাতের মুঠো খুলে দেখো……

……কি আছে?……

……তোমার ভবিষ্যৎ!……

তার আগে পরে অনেক কথা লেখা ছিলো, মুছে গেছে, সেটা কিসের বিজ্ঞাপন আমি আজও জানি না।

## কয়েকটি উন্মাদ

উন্মাদদের ভাষা ভারি সাঙ্কেতিক হয়। হঠাৎ শুনলে মনে হয়, মহৎ, সাহিত্যের উদ্ধৃতি। ওরা বাস্তব নিরপেক্ষ, চোখে যা দেখে—তাকে অবিশ্বাস এবং অবহেলা করতে পারে। ছেঁড়া কাপড়ে কেউ সেজে থাকে সম্রাট, বাতাসকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে যুদ্ধ করে, কেউবা যেন

সমস্ত পৃথিবীকে অনবরত দয়া করে চলেছে।

উন্মাদেরা এমন কিছু আকর্ষণীয় নয়। ওদের মুখে গম্ভীর কথা শুনলেও হাসি পায়, করুণ ব্যবহার দেখলেও দয়া হয় না। কারণ ওরা বোধহীন। একটি উন্মাদের শরীরটা মানুষের মতো, কিন্তু ভিতরের মানুষটি নেই। এমনকি একটি পশুরও যেটুকু আত্মচেতনা থাকে—বদ্ধ উন্মাদেরা তার থেকেও বঞ্চিত হয়। একদিন একটি অপ্রকৃতিস্থ বিশালকায় পুরুষকে একখণ্ড পাথর ঠুকে ঠুকে নিজের কপাল থেকে রক্ত বার করে হো-হো করে হাসতে দেখে বুঝেছিলাম ঐ লোকটির শরীর আর ওর নিজের নেই। আর, শরীরের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হলে মনুষ্যজন্মের কিইবা বাকি থাকে।

মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কোনো মানুষের নেই, কারণ পুনর্জীবন পাওয়া যায় না। কপালে বুলেট বিঁধিয়ে কিংবা পায়ের শিরা কেটে কিংবা আধ ডজন ঘুমের ওষুধ খেয়ে একবার মৃত্যুকে—যত কষ্টই হোক, চেখে দেখতুম—যদি আবার জেগে উঠে এই ভুবনমনোমোহিনীকে দেখতে পারার নিশ্চয়তা পেতুম। অনেক মানুষকে সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়ে পুনরায় সেই দুর্লভ জ্ঞান ফিরে পেতে দেখেছি। তাদের কি সেই অচেতন জীবনের কথা মনে থাকে! জানি না।

তবে বদ্ধ উন্মাদ দশা থেকে হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেলে দেখেছি সেই মানুষটি হঠাৎ বড় দুঃখী হয়ে পড়ে। হয়তো এই জীবনের স্বাদ এতই তীব্র যে হঠাৎ বিদ্যুতের মতো চেতনা ফিরে এলে সমস্ত অস্তিত্বকে ঝলসে দেয়। নচেৎ বদ্ধ-উন্মাদদশায় পাগলেরা বেশ সুখেই থাকে মনে হয়, অন্তত সুস্থ মানুষের চেয়ে যে তারা উঁচু একথা তাদের ব্যবহারে বেশ স্পষ্ট। পাগলেরা কথা বলে, চিৎকার করে, পা ফেলে দুম্ দুম্ করে, মুখভঙ্গী করে ভয়ংকর। বেদনাচ্ছন্ন, দুঃখী পাগল খুব কম দেখা যায়। দুঃখ চতুর্গুণ প্রবল হয়ে ফিরে আসে তখনই—যখন অকস্মাৎ চেতনা ফিরে আসে।

আমাদের পাশের বাড়ির রকে একটি মেয়ে কদিন ধরে এসে রয়েছে। কোথা থেকে হঠাৎ এল কে জানে। আর যেতে চায় না।

জায়গা নোংরা করে। মেয়েটা ফর্সা, বয়েস তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে, শরীর প্রায় ভেঙে গেছে। খুব সম্ভবত পূর্ববঙ্গের নির্যাতিত। খবরের কাগজে এবং গল্পে যাদের কথা পড়েছি তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। মেয়েটি বদ্ধ উন্মাদ। কথাবার্তা সম্পূর্ণ উল্টোপাল্টা, মাঝে মাঝে দু-এক লাইন রামায়ণ মহাভারত বলে—তাতে মনে হয় কিছুটা হয়তো লেখাপড়া জানতো। কোনো স্মৃতি নেই, কোনো কথার মধ্যেই কোনো সঙ্গতি নেই। যেমন: 'মা একটু সুপারি দেবেন, খাম পোস্টকার্ড বানাবো। বিড়ালটা ঘুর ঘুর করে ক্যান—ওর মায় তো মাদারীপুরে উকীল হইছে।' কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, পাগলী তোর নাম কি? ও উত্তর দেয়, 'আমার নাম? আমার নাম সুজি। চিনি কম দিচ্ছে। তাই মিষ্টি না।' এই সব কথা শুনে সকলে হাসাহাসি করে। রোদ্দুরে পোড়ে, বিষ্টিতে ভেজে, এঁটোকাঁটা খায়, কুকুর বিড়ালের সঙ্গে মারামারি করে। রাত্তির বেলায় একটুও ঘুমোয় না, এলোমেলো চিৎকার করে। ওর প্রতি কারুর দয়া করারও উপায় নেই। রাত্তিরে বৃষ্টিতে ভিজে কষ্ট পায় বলে এক ভদ্রলোক তাঁর সদর দরজার মধ্যে থাকতে দিয়েছিলেন—কিন্তু মাঝরাত্তিরে সে এমন চিৎকার করতে আরম্ভ করলো যে বাধ্য হয়ে তিনি তাকে বার করে দিলেন। আমি ওকে দেখে এক নজরেই বুঝে নিয়েছিলুম যে ওর আর কোনো আশা নেই, মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া।

একদিন প্রবল বর্ষণমন্দ্রিত মধ্যরাত্রে আমি সেই উন্মাদ মেয়েটার গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলুম। মেয়েটা হেঁচকি তুলে তুলে কাঁদছে আর বলছে, 'কতদিন কিছু খাই নাই, পরার কাপড় নাই···উঃ, পারি না, কোথায় যাব আমি···আর পারি না।' জানলা দিয়ে দেখলুম মেয়েটা হাঁটুতে মুখ ঢেকে যে-কোনো উপন্যাসের নায়িকার মতো রোদন করছে। একবার মুখ তুললো সে—তার বৃষ্টিধৌত মুখ দেখলুম, অশ্রুময় চোখ দেখলুম—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে কি মেয়েটা পাগলিনীর ছদ্মবেশে আছে—না তার জ্ঞান ফিরে এসেছে!

পরদিন সকালে তাকে আবার দেখলুম রুটির টুকরো নিয়ে কুকুরের

সঙ্গে লড়াই করতে। চোখের দৃষ্টি কুকুরটার চেয়েও ভয়ানক উগ্র। আমার ইচ্ছে হলো, কাল রাত্রের কথা ওর মনে আছে কিনা জিজ্ঞেস করি।

কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় একটা ছেলেকে দেখতুম—ভারি হাসিখুশী সুন্দর ছেলেটা। সামান্য মুখ চেনা ছিলো। একদিন পথে দেখা হতে জিজ্ঞেস করলুম, কি, খবর ভালো? যেমন সকলেই করে। ছেলেটি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, 'চুপ, কথা বলবেন না, পিছনে স্পাই ঘুরছে!' আমি ঘাবড়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললুম, কেন ব্যাপারটা কি? ছেলেটা বললো, 'জানেন না, সারা কলকাতায় আমাকে মারবার জন্য স্পাই ঘুরছে। আশেপাশেই রয়েছে দেড়শোজন।'...আমি সেখান থেকে সরে পড়লুম। পরে একজনের মুখে শুনলুম, ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে। একদিন দেখলুম একটা ট্যাক্সিতে ওর বাবা দাদা ওকে নিয়ে যাচ্ছে—খুব সম্ভবত কোনো উম্মাদ আশ্রমে বা স্পেশালিস্টের কাছে, ছেলেটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করছে।

আশ্চর্য, কিছুদিন বাদেই দেখি এক কফিখানায় স্পোর্টস গেঞ্জি পরে ছেলেটা একদল বন্ধু নিয়ে হৈ-হৈ করছে। আমি কৌতূহল গোপন করতে না পেরে সোজা ছেলেটাকে বললুম, তোমার আগেকার কথা, সেই অবস্থার কথা মনে আছে একটুও? ছেলেটা একটু গম্ভীর হয়েই পরমুহূর্তে হেসে বললো, ছেড়ে দিন ওসব কথা। বসুন, কফি খান।'

রামসদয়বাবু আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। অত্যন্ত সৎ শান্ত, সওদাগরী অফিসের বড়বাবু, জীবনে কখনও নেশা ভাঙ করেন না। আগে আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন, বছর দুয়েক আগে দমদমে বাড়ি করে চলে গেছেন। হঠাৎ দিনকয়েক আগে রাত্তিরে পাশের বাড়িতে একটা গণ্ডগোল শুনলুম। বেরিয়ে গিয়ে ব্যাপার দেখে চমৎকৃত হলুম। রামসদয়বাবুর চুল উস্কোখুস্কো, চোখ ভয়ংকর লাল, পাশের বাড়ির কড়া ধরে প্রবলভাবে আওয়াজ করছেন। অস্বাভাবিক কণ্ঠে চিৎকার করে বলছেন, 'খোকন, খোকন, আমার চটিজুতো কোথায় রেখেছিস!' সে-বাড়ির বর্তমান ভাড়াটেরা বিব্রত। অনেক

কষ্টে তাঁকে আমাদের বাড়ি নিয়ে এলুম, ঘুম পাড়ালুম, তাঁর বাড়িতে খবর দিলুম। ভদ্রলোক নেশা-টেশা কিচ্ছু করেননি, হঠাৎ ঐরকম হয়েছিলো, পরের দিন কিছুই মনে নেই।

মাতালদের অনেক আশ্চর্য ব্যবহার দেখেছি। কিন্তু একটা সাধারণ দৃশ্য কিছুতেই আমি ভুলতে পারি না। ঠিক এসপ্লানেডের মোড়ে রাত্রে শেষ দু নম্বর বাসের দোতলায় বসে ছিলুম। কি কারণে বাসটা দেরি করছে। একটু দূরে গাছপালার আড়ালে জনছয়েক যুবক তীব্র গলায় ঝগড়া করছে—কথা শুনে বুঝলুম মাতাল। কেউ ঝগড়া থামাচ্ছে না —সকলেই কৌতূহলে মজা দেখছে। হঠাৎ দেখলুম—তার মধ্যে দুজন বিপরীত দিকের বাসে দৌড়ে উঠে গেলো। তাও গণ্ডগোল থামলো না। তারপর একজন শব্দ করে কেঁদে উঠে উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে একটা ট্যাক্সিতে উঠে গেলো—আর দুজন তার পিছনে পিছনে 'দাঁড়া দাঁড়া' বলে চিৎকার করতে করতে ছুটলে—একটু পরে তারাও আর একটা ট্যাক্সিতে উঠলো। একজন একা দাঁড়িয়ে রইলো। সেই লোকটাই বেশি চিৎকার করছিলো, কুৎসিত গালিগালাজ দিচ্ছিলো—দলের মধ্যে সেটাই বেশি বদমাস—বুঝতে পেরেছিলুম।

কিন্তু দেখলুম, সকলেই হঠাৎ চলে যাবার পর লোকটা বিষম বিস্মিত হলো। হেলেদুলে সে রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে এলো। চোখে মুখে তার কি নিদারুণ যন্ত্রণা! মনে হলো, অকস্মাৎ সঙ্গীহীন হয়ে পড়ে সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। মনে হলো, সঙ্গীহীন মাতালের মতো দুঃখী আর কেউ নেই পৃথিবীতে। কাল নেশা কেটে গেলে ওর কি এসব মনে থাকবে—এই নির্জনতার দুঃখ কি সহস্র গুণ হয়ে ওর বুকে বাজবে?

লোকটা এসে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো, ওর মাথাটা অসহায়ভাবে ঝুলে পড়লো,—আমাদের বাস ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছে। যতদূর দেখা যায়—আমি ঘাড় ফিরিয়ে ওর করুণ, নির্জন মূর্তির দিকে চেয়ে রইলুম।

# নীললোহিতের নোট বই

আমার বাড়িতে প্রায়ই সকালবেলা কয়েকজন পাখিওয়ালা আসে। তারা আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করে। আমার বাড়ির লোক তাদের ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করে এবং ব্যবস্থা করে যেন তাদের ডাক আমার কানে না পৌঁছোয়। কারণ, আমি তাদের দেখতে পেলেই কিছু টাকা খরচ হবে।

পাখিওয়ালা নামটা শুনলে যা মনে হয়, এরা কিন্তু তা নয়। এরা খাঁচায় পোষার জন্য পাখি আনে না। এরা আনে সুন্দরবনের কাছাকাছি এলাকা থেকে। নানারকমের পাখি ধরে আনে, খাঁচায় নয়, দড়িতে বেঁধে। পোষার জন্য নয়, মাংস খাওয়ার জন্য। এই পাখিগুলোর নাম স্নাইপ, বগেরি, স্নিপেট—এবং আকাশে ওড়া হাঁসও থাকে মাঝে মাঝে।

আমি মাংসাশী ধরনের লোক। গরু-শুয়োর কিছুই বাদ দিই না। এই পাখিগুলোর দামও বেশি নয়—হিসেব করলে মুরগীর মাংসর চেয়ে সস্তাই পড়ে। এবং অতি সুস্বাদু যে, তা বলাই বাহুল্য।

আমার বাড়ি থেকে ফিরে গেলেও ওরা নিরাশ হয় না। অনেক সময় রাস্তায় আমাকে ধরে। দু'হাত ভর্তি পাখি দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে, বাবু, নেবেন না? খুব ভালো পাখি আছে।

আমি পাখিগুলোকে ভালোভাবেই যাচাই করি। দরদামের খুব দরকার হয় না, কারণ রেট বাঁধা। অনেক সময় ধারেও দিয়ে যায়। পাখিগুলোকে কাটাকুটিও করতে হয় না নিজের হাতে—ওরাই সেইসব করে দিয়ে যায়। জায়গা-টায়গাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে যায় পর্যন্ত। কিন্তু ঐ যে জ্যান্ত পাখিগুলোকে দরজার সামনে বসে বসে কাটে—সেই জন্যই বাড়ির লোকের আপত্তি। আমি বলি তোমরা না দেখলেই পারো।

আমি ছাড়া আমার বাড়ির আর কেউ ঐ মাংস পছন্দ করে না। কিন্তু ভালো জিনিস একা খেয়ে তৃপ্তি নেই। অন্যদের ডেকে ডেকে মাংস খাওয়াতে গেলে তো শুধু মাংস খাওয়ালে চলে না—অনেক কিছু আনুষঙ্গিক লাগে। সুতরাং নেমন্তন্ন না করে আমি বন্ধুবান্ধবদের গল্প করি।

বন্ধুবান্ধবরা প্রায় সকলেই এ ব্যাপারটাতে খুবই আগ্রহ দেখায়। তারা বলে পাখির মাংস? এ তো দারুণ ব্যাপার! অনেকদিন খাইনি। আমায় পাঠিয়ে দিও তো। কেউ কেউ আমার বাড়ি এসে খেয়ে যাবার কথাও বলে, আমি তাতে পাত্তা দিই না।

পাখির মাংস এমন কিছু দুর্লভ ব্যাপার নয় কলকাতায়। নিউ মার্কেটে পাওয়া যায়—অন্য কোনো বাজারেও নিশ্চয় পাওয়া যায়। কিন্তু উদ্‌যোগ আয়োজন করে বাজারে গিয়ে আর কেনা হয়ে ওঠে না। তাছাড়া, বন্ধুবান্ধবরা অনেকে কখনো বাজারে পা-ই দেয় না। এই বাড়িতে এসে পাখি দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাতেই তারা বেশি আগ্রহ বোধ করে। এবং যেহেতু আমার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে, তাই আমাকে ওরা খাতির করতে শুরু করে।

একদিন আমার এক বান্ধবী এসেছিলো আমার বাড়িতে। তখন দরজার বাইরে দু'ডজন বগেরি পাখিকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হচ্ছে এবং একটি বাচ্চা ছেলে খুব নিপুণ হাতে তাদের ছাল ছাড়াচ্ছে।

মেয়েটি সেই দৃশ্য দেখে দারুণ চমকে উঠলো। তাকাতে পারলো না, মুখ ফিরিয়ে নিলো।

ভেতরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, এই পাখি কে খায়?

অম্লানবদনে উত্তর দিলুম, আমি।

—তুমি?

মেয়েটি এমনভাবে আমার দিকে তাকালো, যেন আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। খানিকক্ষণ কথা না বলে গুম হয়ে বসে রইলো।

আমি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলুম, দোষ করেছি কিছু?

সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, আমি ভেবেছিলুম আপনার শরীরে দয়ামায়া আছে।

—নেই? আমাকে তো কেউ নির্দয় বলে না।

—ঐ পাখিগুলো খেতে আপনার কষ্ট হয় না? কি সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট পাখি।

—আমি না খেলেও আর কেউ তো খাবেই। বিক্রির জন্য ধরে এনেছে। পাখিগুলো মরবেই। সুতরাং আমি খেলে দোষ কি? খুব ভালো খেতে।

—তবু আপনার খাওয়া উচিত নয়।

আমি একটুক্ষণ থেমে বললাম, তুমি মুরগির মাংস খাও না?

মেয়েটি স্থির চোখে আমার দিকে তাকালো। আমি মেয়েটিকে একটি লেকচার দিতে উদ্যত হয়েও থেমে গেলুম। বললুম, আচ্ছা ভাই খুব দোষ হয়ে গেছে। আর কোনোদিন খাবো না।

মেয়েটি অভিমান করে বললো, না, না, আমার কথা শুনেই আপনি ছাড়বেন কেন? আপনার যদি ভালো লাগে—

—তোমার জন্য আমি অনেক কিছু ছাড়তে পারি।

—আহা-হা!

এরপর কিছুক্ষণ হাল্কা কথাবার্তা হলো, মেয়েদের সঙ্গে ইয়ার্কির সুরে কথা বলতে কার না ভালো লাগে।

যারা মুরগির মাংস খায়—তাদের মধ্যেও কেউ কেউ আমার এই পাখির মাংস খাওয়া বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে। তাদের সবারই বক্তব্য, ঐ সুন্দর ছোট ছোট পাখিগুলো কেটে খাওয়া একটা বীভৎস ব্যাপার। এতেই বোঝা যায় যে, দয়া-মায়া-নির্দয়তা ইত্যাদি শব্দগুলো আপেক্ষিক। ওর সীমানাগুলো মানুষের মনগড়া।

আমাদের বাড়ির ঘুলঘুলিতে প্রতি বছরই শালিক পাখি বাসা বাঁধে। যখন তাদের বাচ্চা হয়, তখন কাকেরা প্রায়ই আসে বাচ্চা চুরি করতে। কাকদের মতন এমন দুশমন স্বভাবের পাখি আর হয় না। ওরা ঠোঁট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাচ্চাগুলোকে টেনে আনে।

শালিকরা কাকদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারে না, তারাও শুধু চেঁচামেচি করে দূরে বসে।

ব্যাপারটা আমার একদম সহ্য হয় না। আমি বারবার গিয়ে কাকগুলোকে তাড়িয়ে দিই। কোনো কাজে মন বসাতে পারি না—কাকের ডাক শুনলেই কান খাড়া হয়ে যায়, উঠে গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে হয়। শালিকগুলোও আমাকে তাদের বন্ধু বলে মনে করে। বিপদে পড়লে আমার ঘরের দরজার পাশে বসে পরিত্রাহিভাবে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়।

একদিন ভোরবেলা উঠে দেখি একটা শালিকের বাচ্চা নিচে পড়ে আছে। কাকেরা খোঁচাখুঁচি করে ফেলে দিয়েছে। বাচ্চাটা আজও বেঁচে আছে কিন্তু উড়তে পারে না। শালিক পাখিরা তাদের বাচ্চাদের মুখে করে নিয়ে যাবার কোনো নিয়ম শেখেনি।

ওভাবে পড়ে থাকলে বাচ্চাটাকে একটু বাদেই কাক খেয়ে ফেলবে। সুতরাং বাচ্চাটাকে আমি ঘরের মধ্যে এনে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখলাম, জল দিলাম, চালের গুঁড়ো দিলাম। কিন্তু বাচ্চাটা তখনো নিজে খেতে শেখেনি—ওর মা ঠোঁটে করে ওকে খাইয়ে দেয়। এভাবে থাকলেও পাখিটা মরে যাবে। সেইজন্য আমাকে একটা মই যোগাড় করতে হলো—সেই মইতে চেপে পাখিটাকে আমি আবার ঘুলঘুলির মধ্যে তার বাসায় রেখে দিলাম। পুরো একটা সকাল আমি ব্যস্ত হয়ে কিংবা মত্ত হয়ে ছিলাম পাখিটাকে নিয়ে।

এই ঘটনা শুনে লোকে কি আমাকে দয়ালু বলবে? বলা উচিত বোধ হয়। কিন্তু শালিক পাখির মাংস খাওয়ার রেওয়াজ যদি মনুষ্য সমাজে থাকতো—তাহলে কি আমি বাচ্চাটাকে অতটা দয়া করতাম? কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এক সময় কোনো শালিক পাখি মেরে খেয়ে দেখেছে এবং ঘোষণা করে দিয়েছে যে, ঐ পাখির মাংস খাওয়ার যোগ্য নয়। আমার চেনা এক ভদ্রলোকই একবার শালিক খেয়ে বমি করেছেন। আর কাকের মাংস যে তেতো সে কথাও সবাই জানে। কাকেও নাকি কাকের মাংস খায় না। কাকের মাংস যদি সুস্বাদু হতো

—তাহলে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি একটাও কাক থাকতো না। মুরগি সম্পর্কে কেউ দয়ামায়ার প্রশ্ন তোলে না। ঐ পাখিটা যেন মানুষের খাবার হবার জন্যই জন্মেছে। অথচ, সৌন্দর্যের কথা তুললেও—কয়েকটা মোরগ বা মুরগিকে অপূর্ব সুন্দর দেখতে। গরু সম্পর্কে আমাদের অনেকের মায়া দয়া বেশি—কিন্তু পাঁঠা বেচারা কি দোষ করলো? সে কেন দয়া পায় না? আর দেখতে ভালো বা খারাপ হওয়ার সঙ্গে খাদ্যের গুণাগুণের কোনো সম্পর্ক নেই। অতি বিশ্রী দেখতে ব্যাঙ—কিন্তু ব্যাঙের ঠ্যাং অতি সুস্বাদু। বেগুনের চেয়ে অনেক সুন্দর দেখতে করবী ফুলের বীচি—কিন্তু সেটা আমরা খাই না। চিংড়ি মাছ আসলে একটা পোকা—কিন্তু সেটারই বাজার দর বেশি। জে. বি. এস. হ্যালডেন একবার বলেছিলেন যে মাছের কোনো অনুভূতি নেই—সুতরাং নিরামিষাশীরাও মাছ খেতে পারে। আর যে-কোনো প্রাণী হত্যাই হত্যা—কিন্তু মাংসভুকরা এক একটা প্রাণী সম্পর্কে হঠাৎ দয়ালু হয়ে ওঠে, আবার এক একটা প্রাণী সম্পর্কে নির্দয়।

যাই হোক, আমার সেই পাখির মাংস খাওয়া এখন বন্ধ। সেই মেয়েটির কাছে কথা দিয়েছিলাম বলেই নয়। সেটা যে ঠাট্টাছলে বলেছিলাম, সেটা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করতে হবে না। কিন্তু পাখিওয়ালারা আর আমার বাড়িতে আসে না, তাদের দেখতেই পাই না।

বেশ কিছুক্ষণ আসবার পর আমি পাখিওয়ালাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছিলাম। ওদের ঘর-সংসারের কথা জিজ্ঞেস করতাম, ওদের গ্রামের খবর নিতাম। একদিন একজন পাখিওয়ালা বললো, বাবু, একটা কথা বলবো আপনাকে?

আমি বললাম, বলো না।

সে বললো, আমাদের বড় অভাব। এ পাখি বিক্রি করে আমাদের পেট চলে না।

—সে কি, একদিনে তো প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ টাকার পাখি বিক্রি করো—তাতেও চলে না?

—সে তো বছরে মোটে ক'টা মাস। গরম কালে তো আর এসব

পাখি আসে না। তা ছাড়া মহাজনের কাছে আমাদের অনেক ধার।

যাই হোক সে যা বলল, তার মানে হলো এই যে, পাখি ধরার জন্য যে বড় বড় জাল লাগে, সে জাল কেনার সামর্থ্যও ওদের নেই। মহাজনের কাছ থেকে জাল ভাড়া করতে হয়। সেই ভাড়ার টাকা দিয়ে ওদের আর বিশেষ কিছু লাভ থাকে না।

আমি বললাম, তোমরা নিজেরা কোনো রকমে একবার একটা করে জাল কিনে ফেলো না কেন?

লোকটি বললো, জালের দাম একশো কুড়ি টাকা। কিছু টাকা সে জমিয়েছে। আমি যদি তাকে পঞ্চাশ টাকা ধার দিই, তাহলে সে জাল কিনতে পারে। সারা বছর সে আমাকে পাখি খাইয়ে আমার টাকা শোধ দেবে।

আমি দিয়ে দিলাম তাকে পঞ্চাশ টাকা। তারপর থেকে আর পাখিওয়ালা কোনো দিন আমার বাড়িতে আসেনি। লোকটাকে দোষ দিতে পারি না—হয়তো বেশি অভাবের তাড়নায় টাকাগুলো খেয়ে ফেলেছে কিংবা কারুর অসুখবিসুখে খরচ হয়ে গেছে। কিংবা পাখি ধরা ছেড়ে অন্য ব্যবসাতেও নামতে পারে।

কিন্তু একেই বোধ হয় বলে পাখি উড়ে যাওয়া।

## দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

খবরের কাগজের বিভিন্ন পৃষ্ঠার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক আছে। সভ্যতার এই প্রবল উপসর্গটিকে বাদ দিয়ে চলার কোনো উপায় নেই আজকের সভ্য মানুষের।

খবরের কাগজ সহযোগে চা না পেলে সকালটাই বিস্বাদ লাগে। ভোরবেলা সাইকেল চেপে হকার কাগজটা ছুঁড়ে দিয়েই বিদ্যুৎবেগে প্রস্থান করে। টাট্‌কা কাগজের গন্ধ চায়ের সঙ্গে ভারী সুস্বাদু। বাড়ির মধ্যে যে লোকটি প্রথম ভাঁজ ভেঙে কাগজ পড়তে পায় তাকে ঈর্ষা

হয়। ভাঁজ ভাঙা দুমড়ানো কাগজ অপরের উচ্ছিষ্ট খাবারের মতোই।

প্রথম পৃষ্ঠার বড় বড় হরফের উপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে যে-যার আপন আপন প্রিয় পৃষ্ঠায় চলে যায়। মেয়েরা চলে যায় সিনেমা-থিয়েটার—ছেলেছোকরারা যায় খেলার পাতায়। আমাদের পাড়ায় একটি তিনবার ম্যাট্রিক ফেল ছেলেকে রোজ আধ ঘণ্টা ধরে ইংরেজী কাগজের বিশেষ পাতাটা পড়তে দেখি।—অদম্য উৎসাহবলে ইংরেজী ভাষার বাধাও সে অনায়াসে তুচ্ছ করে। একটু যাঁরা দায়িত্বজ্ঞানশীল তাঁরা মনোনিবেশ করেন সম্পাদকীয় কলমে। অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধেরা প্রথম পাতার প্রথম শব্দ থেকে শেষ পাতার প্রিন্টার্স লাইন পর্যন্ত পড়েন, এমন কি বিজ্ঞাপনগুলিও মুখস্ত। প্রত্যেকদিনই কাগজ থেকে একটা প্রধান ঘটনা তাঁরা খুঁজে বার করবেন—তারপর পারিবারিক সম্মেলনে সেটাকে সবিস্তারে বর্ণনা করবেন। খুব চমকপ্রদ খবর হলে পড়তে পড়তেই চেঁচিয়ে উঠবেন, ওরে দেখছিস, পণপ্রথা আইন করে বন্ধ হয়ে গেল। হেনা, তোর মাকে ডাক!

কাগজের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটি বড় সাদামাঠা। তবু বোধ করি এই পাতার পাঠকসংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। সকালবেলা চায়ের দোকানে কিংবা পাড়ার লাইব্রেরীতে দলে দলে সংবাদপত্রসেবী বসে আছে, কাগজের অন্য পৃষ্ঠাগুলি গড়াগড়ি যাচ্ছে—সেগুলির উপর উদাস ভাবে চোখ বুলোচ্ছে সকলে, কিন্তু সকলেরই উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা, কখন দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায়। কেউ কেউ বা পাড়াপড়শীর বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করে, 'খোকন, দেখো তো তোমার কাকামণির কাগজ পড়া হয়েছে? আমার শুধু ফার্স্ট পেজটা (আসলেঃ দ্বিতীয় পৃষ্ঠা) পেলেই চলবে।' যাদের বাড়িতে কাগজ আসে এবং শুধু দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটাই যাদের লক্ষ্য—তাদের মর্মবেদনা ভাষায় বোঝাবার নয়।

আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানে কোনোদিন রাজনীতি কিংবা ফুটবল ক্রিকেট কিংবা কেচ্ছার খবর নিয়ে আলোচনা শুনিনি। সব আলোচনা সেখানে চাকরির বিজ্ঞাপন নিয়ে। কোনটায় কত নেবে, কোনটায় কি রকম স্কেল, কোন চাকরি কাকে ধরলে পাওয়া যায় এই

সব গবেষণা। চায়ের দোকানটি একেবারে বেকারদের স্বর্গ। এক-একজনের বেকারত্বের আয়ু প্রায় ঐতিহাসিক। প্রধান হলেন গোবর্ধনদা, তিনি আজ একত্রিশ বছর ধরে বেকার। আজও তাঁর সমান উৎসাহ এ ব্যাপারে। আমি ওঁদের দলে বসি—কিন্তু নিতান্ত অর্বাচীন। আমার মাত্র বছর সাতেক হলো। ওঁরা সকলেই আমাকে উৎসাহ দেন। আমি মহোৎসাহে দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পড়ি, লোভনীয়গুলিতে দাগ দিই—কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন কিংবা ইণ্টারভিউ দেবার মতো বোকামি করি না। অন্য কারুর বাড়িতে বেড়াতে গেলে যদি দেখি একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে—যে-কাগজ আমি রাখি না, তবে অন্যমনস্কভাবে একবার দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটা উল্টে দেখি। ভাবি, খবর নিশ্চয়ই আমার কাগজ আর এ-কাগজে প্রায় একই থাকবে, কিন্তু চাকরির খবর দু-একটা নতুন না থেকে কি আর পারে।

কি সুন্দর এই পৃষ্ঠার চেহারা। একটাও ছবি কিংবা ব্লক নেই। নিখুঁতভাবে জমাট অক্ষরগুলো বোনা। সব খবরই চরম সংক্ষিপ্ত, প্রত্যেকটি শব্দ প্রয়োজনীয়, 'অমুক পৃষ্ঠায় দেখুন'-এর ঝামেলা নেই। মাঝে মাঝে মোটা মোটা W অক্ষর ছড়ানো—অথবা 'আবশ্যক'-এর আ—আ চিৎকার।

শুধু চাকরিবাকরি নয়, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আরও অনেক সরস খবর থাকে—সেগুলিও খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি। যেমন, হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ, বাড়িভাড়া, পাত্র-পাত্রী। এগুলির চেয়েও মজার 'চাকরী-প্রার্থী' কিংবা 'বাড়িভাড়া চাই'। দুটি সুন্দর খবর মনে পড়লো। কিছু-দিন আগে একটি ইংরেজী দৈনিকে একজন চাকুরীপ্রার্থীর আবেদন বেরিয়েছিলো—

A lazy Dutchman seeks an easy job.—

একটি কুঁড়ে ওলন্দাজ একটি বিনা-খাটুনির চাকরি চায়—এই ছিলো হেডিং।

তারপর অবশ্য লোকটার নামের শেষে অনেকগুলো ডিগ্রী, অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ মারা আছে। স্পষ্ট মনে হয়, লোকটা বহু দেশ ঘুরেছে

বহু কাজ করেছে, এখন এই কলকাতা শহরে প্রৌঢ় বয়সে সে একটু বিশ্রাম চায়। চায় এমন একটা চাকরি, যাতে পরিশ্রম নেই, অর্থাৎ কাজ থাকবে না, মাইনেটা হবে বেশ পুরু।

'বাড়িভাড়া চাই'-এর বিজ্ঞাপনটি হুবহু এই : 'দুইখানি ঘড় ভাড়া চাই, বাথরুম, রান্নাঘর, আলো-হাওয়া না থাকিলেও চলিবে। শুধু মাথার উপর ছাদ এবং ঠিকানা থাকিলেই চলিবে। ভাড়া সাধ্যমতো দিবো। যদি কেহ ভাড়া দিতে সম্মত থাকেন, তবে মঙ্গলবার হইতে শনিবার পর্যন্ত সকাল আটটা হইতে নয়টা পর্যন্ত সবুজ আলোয়ান পরিয়া যে-লোকটি হাজরা রোডের মোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিবে, তাহার সহিত দেখা করিলে বাধিত হইবো।'—বেশ বড় বিজ্ঞাপন, শেষ বাক্যটি পড়ে চমকে উঠেছিলাম। পরে বুঝতে পারলাম, লোকটার আপাতত কোনো ঠিকানা নেই, হয়তো ধর্মশালায় কিংবা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে থাকে। হাজরার মোড়ে সবুজ র‍্যাপার পরিহিত অবস্থায় বাড়িওয়ালার জন্য প্রতীক্ষিত লোকটির বিমর্ষ মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

পাত্রপাত্রী বিজ্ঞাপনের প্রত্যেকটিই মজার। চোখের সামনে প্রতিদিন স্বাস্থ্যহীন, ভগ্নহৃদয়, চাকুরিহীন অথবা চাকুরিতে misplaced অসংখ্য নারী-পুরুষ দেখতে পাচ্ছি, অথচ পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে অসংখ্য সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান, উচ্চপদস্থ পুরুষ রমণী। এরা কোথায় চোখের আড়ালে থাকে কে জানে।

নিরুদ্দেশ বার্তার রহস্যটি এখন সকলেই ধরে ফেলেছেন। 'খোকন ফিরিয়া এসো, মা শয্যাশায়ী, টাকার প্রয়োজন হইলে জানাও'—এই বিজ্ঞাপনের প্রকৃত বক্তব্য যে কি তা সকলেরই জানা। শুধু একটা ব্যাপার খুব করুণ লাগে। প্রতিদিনই কয়েকটি করে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন থাকে। কিন্তু তাদের খুঁজে পাওয়া গেলে সে-খবর কেউ কাগজে দেয় না। এই যে—খোকন কিংবা বিমল কিংবা অরুণাংশু কিংবা ললিতা কিংবা স্বর্ণময়ীর দল নিরুদ্দেশে গেলো—এরা কখনও ফিরে আসে কিনা জানি না। মনে হয়, এরা চিরকালের নিরুদ্দিষ্টের দল।

'টেণ্ডার' নামে যে ভয়াবহ বিজ্ঞাপনটি অধিকাংশ দিনই দ্বিতীয়

পৃষ্ঠায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে, অনেক চেষ্টা করেও ওগুলি কোনোদিন পড়তে পারিনি। তবে শুনেছি, যারা ও খবর পড়ে, তাদের আর কিছু পড়বার দরকার হয় না।

## কলকাতার চায়ের দোকান

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই খবরের কাগজ সহযোগে এক কাপ চা খেতে হয়। এবং খবরের কাগজ শেষ করতে করতে আবার গলা শুকিয়ে যায়। তখন কোনোক্রমে গায়ে জামাটি গলিয়ে গুটিগুটি যেতে হয় মোড়ের চায়ের দোকানে।

ততক্ষণে ধোঁয়া এবং তর্কে দোকান ভরে গেছে। একটি চেয়ার খালি নেই। কোনো টেবিলে ক্রিকেট, কোনো টেবিলে নেহরু কিংবা পঙ্গপাল, কোনো টেবিলে মেরিলিন মন্‌রো কিংবা আধুনিক কবিতা। আমার দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করলো না। আমি ম্যানেজারবাবুকে গিয়ে বললুম, ম্যানেজারবাবু, আপনাকে বাইরে কে যেন ডাকছে। ম্যানেজার উঠে বাইরে যেতেই আমি তার চেয়ারটা তুলে নিয়ে এসে একটা টেবিলের সঙ্গে কোনোক্রমে জুড়ে বসে পড়লুম। এবং সহজেই আলোচনাতেও নিজেকে জুড়ে দিলুম।

পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক, তবু সকালবেলা একবার চায়ের দোকানে না গেলে চলে না। কলকাতার চরিত্র বোঝা যায় সকালবেলা চায়ের দোকানে এলে। সকালবেলা, বিকেলবেলা নয়। বিকেল-সকালে অনেক পার্থক্য। সকালবেলা চায়ের দোকানের চেহারা অতিশয় সূক্ষ্ম থাকে। চা-টোস্ট ছাড়া বিশেষ কিছু কেউ খায় না, বাকিটা আড্ডা। কলকাতার কোনো চায়ের দোকানেই চপ-কাটলেট-মাংসকারি সকালবেলা পাওয়া যায় না। ওসব বিকেলবেলা। তখন গো-গ্রাসে খেতে আসে সকলে, অথবা ক্যাবিনে খাবার সামনে রেখে কপোত-কপোতী কূজনালাপ করে।

বাড়িতে যত সুন্দর, যত দামী চা-ই দিক, দোকানের চা না খেলে মন ভরে না। কারণ সেখানে বিনা পয়সার আড্ডা আছে। আর সে কি আড্ডা, পৃথিবীর সব বিষয় নিয়ে। আর কি বিষয় নিয়ে কোন দিকে যে আড্ডা ঘুরবে তা বলা দেবতারও অসাধ্য। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। সিঙাড়ার উপর দুটো পিঁপড়ে ঘুরছে। একজন বললো, ওহে কেষ্ট, পিঁপড়ে দুটো তুলে নাও, নইলে যে পরে মাংসর সিঙাড়া বলে বেশি দাম নেবে তা চলবে না।

—খেয়ে নে, খেয়ে নে, সাঁতার শিখবি। একজন বললো।

—যা, যা, ইস্ট বেঙ্গলের ছেলেকে সাঁতার শেখাতে হবে না। এমনিতেই যা ডুবসাঁতার জানি, কম্পিটিশনে চ্যাম্পিয়নদের কাত করে দেবো।

—ইংলিশ চ্যানেলে নেবে যা না, ডুবসাঁতারে রেকর্ড করবি।

—কোন দিক থেকে উঠবে কোন দিক থেকে নামবে ?

—উঠবে ফ্রান্সে, ফরাসী সুন্দরীরা গলায় মালা দেবে।

—এবারে অমুক ম্যাগাজিনে একটা নতুন ফরাসী অ্যাকট্রেসের ছবি দিয়েছে দেখেছিস ?

—জানিস, ব্রিজিত বার্দোত আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো ?

আলোচনা এলো ফরাসী মেয়ে সম্বন্ধে, তারপর তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর অন্য সব মেয়ের—এবং শেষে চায়ের দোকানের উল্টো দিকের বারান্দার চপলমতি বালিকা সম্বন্ধে। কুড়ি মিনিটের মধ্যে আলোচনা বিশ্বভ্রমণ করে এল। একদিন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা নিয়ে আলোচনা শুরু করে সমুদ্রের তলায় আটলান্টার লুপ্ত রাজধানীতে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম। কি করে হয়েছিল আজ মনে নেই।

চায়ের দোকানগুলি কলকাতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরে চায়ের দোকান আছে—কিন্তু এরকম আড্ডা নেই।

কলকাতার অসংখ্য চায়ের দোকানে বাংলাদেশের যুব-সমাজের মনের কথা উচ্চারিত হচ্ছে। কলকাতার কয়েকটি দোকান আড্ডার জন্য বিখ্যাত। কলেজ স্ট্রীট, মীর্জাপুর স্ট্রীট, ভবানীপুর, কালীঘাটের

কয়েকটি দোকান সাহিত্যিকদের আড্ডাস্থল হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে। চৌরঙ্গীর একটি দোকান বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের মিলনস্থল বলে, পার্ক স্ট্রীটের একটি রেস্টুরেণ্ট রেসের জকিদের জন্য। ছোট রেস্তোরাঁর মালিকরা অতিশয় ভদ্র এবং বিনয়ী। এক কাপ চা নিয়ে ঝাঁপ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকলেও এঁরা নিয়মিত আড্ডাধারীদের কিছু বলেন না। অনেকের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একদিন এক ভদ্রলোক টেবিলে এসে বসে ঔদাসভাবে বললেন, ওহে এক কাপ বিষ দাও তোমাদের, খাই।

ম্যানেজার অত্যন্ত রসিক। তাড়াতাড়ি হাঁক দিয়ে বললেন, ওহে, নীলকণ্ঠবাবুর জন্য এক কাপ খাঁটি বিষ দিও, উনি কিন্তু বিষ ছাড়া কিছু খান না!—বলা বাহুল্য, ভদ্রলোকের নাম মোটেই নীলকণ্ঠবাবু নয়।

ঠিক চায়ের দোকান না হলেও, কলকাতার আর একটি বিখ্যাত আড্ডা-কেন্দ্র হলো কফি হাউস। কলেজ স্ট্রীট এবং এসপ্লানেডে। আগে ছিলো কফি বোর্ডের অধীনে, এখন কো-অপারেটিভ। এখানে লেখক-কবি-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী-অধ্যাপক-রাজনৈতিকদের সম্মেলন হয়। আড্ডা হিসেবে অবশ্য পৃথিবীর সব দেশের কফিখানারই ঐতিহ্য আছে। 'ইনসিওরেন্স' নামক ব্যবস্থাটি—যা আজ সমস্ত সভ্য দেশে প্রচলিত—একদা তার উদ্ভব হয়েছিলো সমুদ্রের পারে কোনো কফিখানার আড্ডায়। কলকাতায় এমন কোনো বুদ্ধি-ব্যবহারজীবী নেই, যিনি কখনও-না-কখনও কফি হাউসে আসেননি। বিদেশী ছাত্রছাত্রী কিংবা সাংবাদিক-লেখক কলকাতায় এলে তাঁদের নিয়ে আসা হয় কফি হাউসে, এদেশের সমগোত্রীয়দের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য।

চায়ের দোকানে, কফি হাউসে যুগ বদলায়। একদল আসে, প্রচণ্ড আড্ডা দেয় দিনরাত, আর কি আড্ডার টান, শ্যামবাজারের চায়ের দোকানে কেউ হয়তো আসে চক্রবেড়িয়া থেকে, কেউ উলুবেড়িয়া। কারুর কারুর ঠিকানাই হয়ে যায় কোনো দোকান, কোথাও দেখা পাওয়া যাক না যাক ওখানে যাবেই। তারপর আস্তে আস্তে তাদের ছোট ভাই, ছোট ভায়ের বন্ধুরা সেখানে আসতে আরম্ভ করে। তখন সেখানে

থেকে পাততাড়ি গুটোতে হয়।

চায়ের দোকানে যারা একলা যায়, তাদের মতো দুর্ভাগা কেউ নেই। তারা তেষ্টা মেটাবার জন্য চা খেতে যায় কিন্তু তেষ্টা মেটে না। ইচ্ছে থাকলে অবশ্য অনায়াসেই আড্ডায় মিশে যাওয়া যায়। খবরের কাগজের পাঁচ নম্বর পাতাটা একটু দিন তো? কিংবা দেশলাইটা দেবেন দয়া করে? এই দিয়ে শুরু করতে হয়। তারপর আড্ডার মেজাজ মর্জি বুঝে একটা তাকমাফিক কথা বলতে পারলেই হলো। আড্ডার দরজা সকলেরই জন্য খোলা। অবস্থা যাই হোক, কেউ বেকার কেউ উচ্চ-পদস্থ হোক—কিন্তু সুরের মিল থাকা চাই। কোন মন্ত্রে যে কাপের পর কাপ চা আসে—উড়ে যায় প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট তা কেউ জানে না। যেদিন তর্ক জমে ওঠে—সেদিন হয় টেবিল ফেটে যায়—নয়তো কারও হাতের চেটো ফেটে রক্ত বার হয়।

চায়ের দোকানের একমাত্র কুৎসিত জিনিস হলো পর্দা ঢাকা ক্যাবিন। পর্দা বলেই অশুভ কৌতূহল বাইরের লোকের, পর্দা বলেই ভিতরে নোংরা হচ্ছে। দেখতে বড় খারাপ। পর্দানশীন মেয়েদের রেস্তোরাঁয় আসবার দরকার নেই, আর কলেজে অফিসে ট্রামে বাসে যাঁরা স্বাধীন —তাঁরা পর্দার বাইরেই বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে বসলে শোভন দেখায়।

যদিও পর্দা-ঢাকা ক্যাবিন না রেখে উপায়ও নেই। কলকাতা শহরে সব আছে—কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য নির্জন স্থান একটু নেই—যেখানে কিছু শোভন মিথ্যে কথা আদানপ্রদান করবে। তা ছাড়া পর্দা-ঢাকা ক্যাবিন না থাকলে গল্প-লেখকদের অধিকাংশ গল্পের প্লটও যে মাঝপথে মারা যাবে।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

নার্সের সামনে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম, নার্স সিরিঞ্জ ফুটিয়ে রক্ত টেনে নিতে লাগলেন। ব্যথা নয়, আমার খুব অস্বস্তি বোধ হলো।

সিরিঞ্জ ফোটাবার আগে, স্পিরিট ভেজানো তুলো দিয়ে নার্স যখন আমার হাতে ঘষে দিলেন, তখনও খুব অস্বস্তি ও ভয় হয়েছিলো। কেননা স্পিরিট ভেজানো তুলোটা ঘষা মাত্র এমন ময়লা হয়ে গেলো যে, মনে হয়েছিলো, নার্স বুঝি আমাকে বকবেন। ধমকে বলবেন, চান-টান করেন না নাকি? আমার হাতখানা দেখতে তো বেশ পরিষ্কারই, রোজ সাবান মাখি না বটে, কিন্তু স্নান তো রোজই প্রায় করি তবু এত ময়লা আসে কোথা থেকে? নাকি স্পিরিট দিয়ে ঘষলে সবারই ময়লা ওঠে? চকচকে আয়নায়ও স্পিরিট ভেজানো তুলো ঘষলে ময়লা ওঠে, তবু আমি নার্সের ধমকের ভয় পাচ্ছিলুম।

রক্ত টানার সময়টা কি দীর্ঘ! শেষ হলে বাঁচি, কেননা ব্যথা নয়, বিষম অস্বস্তি বোধ করছি। আমার হাতখানা ঝুলছে, হাতে সিরিঞ্জ বেঁধানো, কিন্তু আঙুলগুলো প্রায় নার্সের বুকের কাছে, সিকি ইঞ্চির তফাত। যে কোনো সময় ছোঁয়াছুঁয়ি হতে পারে। আমার শুচিবায়ু নেই, কিন্তু এই কি বুক ছোঁয়ার সময়? নার্সের মুখ নির্বিকার, যেন কিছুই আসে যায় না, কিন্তু আমার পক্ষে নির্বিকার হওয়া তো সম্ভব নয়, অথচ, হাত সরিয়ে নেবারও তো আমার উপায় নেই। আঃ, রক্ত নিতে কত সময় লাগে? আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম, সেই মুহূর্তে ছোঁয়া লাগলো, রক্ত নেওয়াও শেষ হলো।

নার্স বললেন, আপনি ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করতে পারবেন?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, আরও কিছু আছে?

—একটা টেস্টের ফলাফল ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই জানা যাবে, আপনি জেনে যেতে পারবেন।

আমি বললুম, আচ্ছা, অপেক্ষা করছি। আপনাকে ধন্যবাদ।

নার্স মুচকি হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা।

মুচকি হাসি কেন? ধন্যবাদ শুনলে কেউ হাসে? কিংবা কিসের জন্য ধন্যবাদ সেই ভেবে হাসি? যে কোনো কারণেই হোক ধন্যবাদ নার্সের প্রাপ্য, আমার মুখের রেখা বিচলিত হয়েছিলো, ধন্যবাদ না বলে আমার উপায় ছিলো না।

বাইরে বেরিয়ে এসে শরীরটা বেশ হাল্কা লাগলো। শরীর থেকে খানিকটা রক্ত দিয়েও এরকম হাল্কা ভাব লাগা আমি আগেও অনেক-বার বোধ করেছি। তাহলে শুধু রক্ত বিয়োগ নয়, আঙুলের ডগাতেও খানিকটা ভালো লাগা আছে। নার্সকে নিশ্চিত ধন্যবাদ।

এখন মুশকিল হলো, এই এক ঘণ্টা অপেক্ষা করা। হাসপাতালটা বেড়াবার পক্ষে আদর্শ জায়গা নয়, কারুকে চিনি না এখানে, একজন চেনা রোগীও নেই। খুব ইচ্ছে হলো কোনো অচেনা রোগীর পাশে বসে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিই। পিতৃশ্রাদ্ধের সময় যেমন অচেনা অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশ্যেও পিণ্ড অর্পণ করতে হয়, তেমনি, নিজের চিকিৎসার সময় অন্য অচেনা কারুর রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করাও উচিত। সেই মুহূর্তে, আমার অদেখা অচেনা কোনো মুমূর্ষু রোগীর উদ্দেশ্যে মনে মনে বললুম, তুমি ভালো হয়ে ওঠো। তুমি আমার সঙ্গে বেঁচে থেকে এই পৃথিবীকে দেখো।

ক্যান্টিনে চা খেয়েও পনেরো মিনিটের বেশি সময় কাটানো গেলো না। তখন এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলুম। বিশাল কম্পাউণ্ড, লাল রঙের বাড়িগুলি। মাঝে মাঝে ফুলবাগানও আছে। কিন্তু, সর্বত্র ডেটলের গন্ধ। ফুলগাছেও ডেটলের গন্ধ, রাস্তাগুলো খোলা ব্যাণ্ডেজের মতন। খারাপ লাগছিলো না। এই সময় একটা অদ্ভুত লেখা চোখে পড়লো, "মোর নার্স কর্ণার, শোকার্ত-আত্মীয়দের বিশ্রাম-গৃহ।" হাসপাতালে এরকম কোনো জায়গার অস্তিত্ব তো জানতুম না, শুনিওনি কখনো, অবশ্য হাসপাতালে এসে শোক প্রকাশ করার সুযোগও কখনো আমার আসেনি। ব্যাপারটা বেশ ভালো লাগলো, যদিও বাংলা অনুবাদটা বিচ্ছিরি—সরকারী কর্মচারীদের অশিক্ষিত বাংলা, কিন্তু 'মোর নার্স কর্ণার' বাক্যটি সুন্দর।

আমি কারুর জন্য শোক করতে চাইনি, নিজের জন্যও নয়, বরং আমি অপরের সুখ প্রার্থনা করছিলুম। তবু ইচ্ছে হলো একবার ঐ জায়গায় দেখে আসি। অবশ্য কেউ বোধহয় ওখানে নেই। সকালবেলা শোকের সময় নয়, সকালবেলা পৃথিবীকে বড় ভালো লাগে, খুবই ইচ্ছে

হয় বেঁচে থাকতে, সন্ধ্যেবেলা বরং বিনা কারণেও বুকে শোক আসতে পারে। অনেক বিকেলবেলা আমার একা মন খারাপ প্রায় শোকের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এখন, ওখানে কেউ না থাকলেই ভালো, শোকের ঘরে বসে মনের সুখে একা একা সিগারেট টানা যাবে। মনে হয়, সারা হাসপাতালে এই একমাত্র নিরিবিলি জায়গা।

ঢুকে দেখলুম, ফাঁক ঘরটিতে একটি মাত্র মানুষ বসে আছে। বিশাল দীর্ঘ চেহারার প্রৌঢ়, হাতের ওপব কপাল রেখে মুখ নিচু, হঠাৎ মনে হয় ঘুমন্ত, কিন্তু শরীরটা মাঝে মাঝে দুলে দুলে উঠছে। অর্থাৎ নিঃশব্দে কাঁদছেন। এতবড় চেহারার একজন পুরুষের কান্না দেখলে কিরকম অস্বাভাবিক লাগে, তাও একা। আমার উচিত ছিলো, নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ওখান থেকে চলে আসা। উনি হয়তো আমায় দেখলে লজ্জা পাবেন। কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহলে আমি স্থানত্যাগ করতে পারলুম না। তাছাড়া, শোকের সময় কি লজ্জা, ভদ্রতা এসব জ্ঞান থাকে? শোকের সময় একজন সঙ্গী পেলে হয়তো খারাপ নাও লাগতে পারে।

আমি লোকটির পাশে এসে দাঁড়ালুম। পায়ের শব্দ পেয়ে ভদ্রলোক দুটি লাল রঙের চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। আমি নরম ভাবে জিজ্ঞেস করলুম, আপনার কি কেউ মারা গেছে?

লোকটি বললেন, না, কেউ মারা যায়নি, ঠিক আছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে তিনি সমস্ত মুখমণ্ডল মুছলেন। মোছার পরও আবার চোখে জল এলো, তিনি আবার মুছলেন। আমি সরলভাবে আবার জিজ্ঞেস করলুম, কেউ মারা যায়নি, তবে আপনি কাঁদছেন কেন? কারুর গুরুতর অসুখ?

—না, কারুর অসুখ নয়, ঠিক আছে।

—অসুখ নয়? তবু আপনি—

—বললুম তো, ঠিক আছে, কিছু হয়নি।

আমি থতমত খেয়ে বললুম, আপনাকে বিরক্ত করলুম, মাপ করবেন। এমনি কৌতূহল হলো—। লোকটি ততক্ষণে নিজেকে সংযত করে নিয়েছেন। গলা পরিষ্কার করে বললেন, না, কিছু না, আমারই

অসুখ ছিলো, আমি আজ সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছি।

—ছাড়া পেয়েছেন, তবুও···আপনি খুশী হননি। এখনো রোগ আছে?

—না, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি।

—তবে?

—আমি তো সুস্থ হতে আসিনি। আমি মরতে এসেছিলাম। মরতে না পেরে—

—আপনি মরতে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ। হাসপাতালে কি সবাই সুস্থ হতেই আসে? অনেকে মরতেও আসে। ইয়ংম্যান, তুমি হাসপাতালে এসেছো কেন।

—আমি এসেছি ভালোভাবে বেঁচে থাকবার জন্য। বেঁচে থাকার যাবতীয় লোভ আমার মধ্যে কাজ করছে এখনো। আপনি মরতে চান কেন? আপনার তো বয়েস এমন কিছু—

—তোমাকে বলে লাভ নেই। মানুষ কেন মরতে চায়। তার যুক্তি সে নিজে ছাড়া আর কেউ বোঝে না।

—তাহলে তো আপনি আত্মহত্যা করলেই পারতেন। শুধু শুধু এতগুলো ডাক্তার আর নার্সদের পরিশ্রম করিয়ে—

—আত্মহত্যা আর মৃত্যু তো এক নয়। আমি ভেবেছিলাম, আমার শরীরের মধ্যে মৃত্যুর বীজ ঢুকে গেছে, সেই বীজ আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠবে, একদিন ঝড়ে উপড়ে পড়বে। আমি জীবনের সমস্ত প্রাপ্য চুকিয়ে মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়েছিলাম। এখন এই অতিরিক্ত জীবন নিয়ে আমি কি করবো?

—হঠাৎ লটারিতে টাকা পেলে লোকে যা করে, আপনি তাই করবেন। ইচ্ছে মতন অপব্যয় করবেন।

ভদ্রলোকের চোখে এখন আর কান্না নেই, এবার ব্যঙ্গের হাসি ফুটলো। বললেন, ইয়ংম্যান, তুমি আমায় উপদেশ দিচ্ছো? তুমি বাঁচতে চাইছো কিনা, তাই খুব অহংকার বোধ করছো, কিন্তু তুমি যে সত্যিই বাঁচতে চাও, তার প্রমাণ কি?

—প্রমাণ, আমার লোভ আছে। এখনো ফুল দেখলে আমার গন্ধ শুঁকতে ইচ্ছে করে, নারীর বুক ছুঁলে শরীরে ঝংকার বাজে, পকেটে পয়সা না থাকলে মন খারাপ হয়ে যায়। এইগুলোই তো বেঁচে থাকার ইচ্ছে, তাই না?

—লোভ? তোমার লোভ থাকতে পারে, আমার নেই। আমি বাঁচতে চাই না।

—কেন?

—আবার সেই প্রশ্ন? তাহলে শোনো, কেউ কেউ বাঁচতে চায় কেউ কেউ মরতে চায়, দুটোরই কারণ এক—ভালো লাগা। মৃত্যু এলেই আমার ভালো লাগবে।

—সত্যিই যে ভালো লাগবে, কি করে জানলেন?

—কারণ বাঁচতে আমার ভালো লাগে না, স্পষ্ট বুঝে গেছি। তোমার কাছে দেশলাই আছে?

ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেট বার করে দেশলাই না পেয়ে আমার কাছে চাইলেন। আমি সহাস্যে ওঁর সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে বললুম, এই যে কিছুক্ষণ সিগারেট না খেলে আপনার মন আঁকুপাঁকু করে—এটাও কি বেঁচে থাকার লোভ নয়?

ভদ্রলোক নিঃশব্দে হাসলেন। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, না। এসব তুচ্ছ। তুমি ছেলেমানুষ, মৃত্যু যে কতবড় নেশা, তা তুমি বুঝবে না।

## নীললোহিতের যৎসামান্য

সব কলেজেই ছাত্রদের দেওয়াল পত্রিকা থাকে। আমাদের কলেজে যে তিনটি দেওয়াল পত্রিকা ছিলো তার মধ্যে দুটি দুই রাজনৈতিক দলের মুখপত্র, খুব গরম গরম কথা থাকতো তাতে। এবং সেই দুটোকে ঘিরেই ভিড় থাকতো বেশি। আর একটি দেওয়াল পত্রিকা একটু

কোণের দিকে অন্ধকারে ঝুলে থাকতো—সেটিতে শুধু গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ। গল্প ও কবিতাগুলো খুবই ব্যক্তিগত আর প্রবন্ধগুলো 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' কিংবা 'চরিত্রহীন উপন্যাসে কে চরিত্রহীন' এই জাতীয়। ঐ পত্রিকাটা প্রকাশ করতো অংশুমান, সে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি আর পাজামা পরতো—এবং খুবই গর্বিত ভাব দেখাতো সব সময়।

একদিন গণেশ কেবিনে অংশুমানকে একা একা চা খেতে দেখে আমি ওর পাশে বসলাম এবং দরাজ গলায় অর্ডার দিলাম, দেখি, দুটো মটন কাটলেট দু প্লেটে।

অংশুমান মুখে কিছু না বলে ভুরু দুটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন করে রাখলো।

আমি চুপি চুপি বললাম, তোর পত্রিকায় আমার একটা গল্প নিবি ?

অংশুমান অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, গল্প লিখবি! তুই ?

আমি একেবারে মরমে মরে গেলাম। অন্যরা শুনে ফেলেছে। একটু আস্তে বললেও তো পারতো !

অংশুমান এরপর হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে বললো, গল্প লেখা কি অত সোজা ? ইচ্ছে করলেই লিখে ফেলা যায় ? আগে লিখেছিস কখনো ?

আমি বাংলাতে বরাবরই কাঁচা। সব পরীক্ষাতেই বাংলায় কম নম্বর পেয়েছি তবু লুকিয়ে লুকিয়ে আমার কবিতা লেখার বদরোগ ছিলো। কারুকে কখনো দেখাইনি। হঠাৎ গল্প লেখার ইচ্ছে জাগার একটা কারণ ছিলো। কলেজে সন্ধ্যাশ্রী নামের একটি মেয়ে আমাকে অপমান করেছিলো। সন্ধ্যাশ্রীর বড় রূপের গর্ব, আমাকে সে গ্রাহ্যই করে না। একদিন এক বাস স্টপে দুজনে দাঁড়িয়েছিলাম—সন্ধ্যাশ্রী বাদাম ভেঙে ভেঙে কুটকুট করে খাচ্ছিলো—এমন সময় থার্ড ইয়ারের সূর্যদা এসে দাঁড়ালো। সূর্যদার খাঁটি হীরো হীরো চেহারা। ক্লার্ক গেবল-এর মতন চওড়া কাঁধ, যেমন অহংকারী, তেমন দয়ালু। সূর্যদা আসতেই

সন্ধ্যাশ্রী হাতের মুঠো থেকে কয়েকটা বাদাম সূর্যদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, খাবেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এই যাঃ, সব ফুরিয়ে গেলো যে! সূর্যদা তাঁর হাতের চারটি বাদামের মধ্যে থেকে দুটি দিলেন আমাকে।

যার রক্তমাংসের শরীর, তার এই সময় রাগে জ্বলে যাবার কথা নয়? ফুরিয়ে গেলো, মানে কি! এতক্ষণ যে কুটকুট করে বাদাম খাচ্ছিলে, তখন আমাকে দেবার কথা মনে পড়েনি। সূর্যদাকে দেখেই অমনি—। আমার সঙ্গে একই বাসে ওঠার কথা ছিলো, কিন্তু সূর্যদার সঙ্গে সে অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করলো। পৃথিবীর সন্ধ্যাশ্রীরা চিরকাল এইভাবে সূর্যদাদের সঙ্গে চলে যায়।

আমি ঠিক করে রাখলুম, সন্ধ্যাশ্রীকে এর একটা জবাব দিতেই হবে। কিন্তু কোন উপায়ে! ওর মুখের ওপর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ঠিক জন্মের সময় ধাইমা আমার কানে কানে বলে দিয়েছিলেন, দেখিস, মেয়েদের সঙ্গে যেন কক্ষনো খারাপ ব্যবহার করিস না। কিন্তু খারাপ ব্যবহার না করা মানেই তো আর সব অপমান সহ্য করে যাওয়া নয়!

তখনই দেওয়াল পত্রিকার ব্যাপারটা আমার মাথায় আসে। দেওয়াল পত্রিকায় কিছু বেরুলেই দু-একদিনের মধ্যে কলেজের সব ছাত্রদের মুখে মুখে ব্যাপারটা ছড়িয়ে যায়। ওর নামটা বদলে দিলেও ওর চরিত্রটা ঠিক ফুটে উঠবে। এবং এই ব্যাপারটা কবিতায় ঠিক জমাতে পারবো না বলেই গল্প লেখার ইচ্ছেটা জাগে।

কিন্তু অংশুমান আমার যোগ্যতা বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করে। প্রথম প্রথম কথাটা উড়িয়েই দেয়। তারপর অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, আচ্ছা দিস, দেখবো যদি চালানো যায়!

চার-পাঁচবার কপি করার পর শেষ পর্যন্ত গল্পটা দিলাম অংশুমানকে। কিন্তু ওর আর পড়ে দেখার সময়ই হয় না! যখনই জিজ্ঞেস করি, অংশুমান উত্তর দেয়, হাতে অনেক লেখা জমে আছে, আগেরগুলো তো আগে দিতে হবে। চায়ের দোকানে ওর সঙ্গে দেখা

হলে ও আর পকেট থেকে পয়সা বের করে না। ধরেই নিয়েছে এখন থেকে ওর খাবারের দাম আমিই দেবো।

লেখাটা টাটকা টাটকা বেরুলেই সন্ধ্যাশ্রীর অপমানের ঠিক মতন জবাব দেওয়া যেতো। তা তো আর হলোই না। এখন সন্ধ্যাশ্রীকে দেখলে দূর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। তবে একটা ব্যাপারে আরাম পেয়েছি, সন্ধ্যাশ্রী সূর্যদার কাছে পাত্তা পায়নি। সূর্যদা তখন নবনীতার জন্য পাগল।

এর কয়েক মাস বাদে কলেজের ইউনিয়ন থেকে একটি গল্প প্রতি-যোগিতা ডাকা হলো। বাইরের সাহিত্যিকরা বিচার করবেন। পুরস্কৃত তিনটি গল্প ছাপা হবে কলেজ ম্যাগাজিনে। কারুকে কিছু না বলে আমার গল্পটা পাঠিয়ে দিলাম সেখানে।

তারপর আবার দুরুদুরু বক্ষে প্রতীক্ষা। মাসের পর মাস কেটে যায়, প্রতিযোগিতার ফলাফল আর বেরোয় না। শুনলাম একশো পঁচাত্তরটা গল্প জমা পড়েছে—বিখ্যাত সাহিত্যিক সেগুলো দেখে ওঠার সময় পাচ্ছেন না।

শেষ পর্যন্ত কলেজ ম্যাগাজিন ছাপা হয়ে বেরুলো পরীক্ষার মাত্র কয়েক দিন আগে। তখন ক্লাস বন্ধ হয়ে গেছে। কলেজ ম্যাগাজিনে কি ছাপা হলো না হলো, তাতে কিছু যায় আসে না।

কিন্তু আমার মন একেবারে ভেঙে গেলো। আমার গল্পটা ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি পেয়েছি থার্ড প্রাইজ। থার্ড হওয়ার মতন অপমানজনক কি আর কিছু আছে? এর চেয়ে আমার গল্পটা ছাপা না হলেও কত ভালো ছিল, কেউ জানতে পারতো না। এখন প্রত্যেকে নিশ্চয়ই আমার কথা ভেবে হাসছে। একটা সামান্য গল্প প্রতি-যোগিতাতেও থার্ড। এর চেয়ে অযোগ্যতা আর কি আছে? রাস্তায় একদিন অংশুমানকে দেখে তাড়াতাড়ি আমি লজ্জায় অন্য ফুটপাথ বদল করলাম।

পরীক্ষার পড়াটড়া আমার মাথায় উঠে গেলো। সব সময় ঐ অপমান কাঁটার মতন বেঁধে। সন্ধ্যাশ্রীর কাছে আমি মনে মনে খুব

অপরাধী হয়ে রইলাম। গল্প লেখার ক্ষমতাই যখন আমার নেই তখন কেন লিখতে গেলাম ওকে নিয়ে? সমুদ্র, নদী, পাহাড়, আকাশ, তাজমহল—এই সব নিয়ে কি কেউ ঠাট্টা করে?

পরীক্ষার ঠিক আগের দিন মনে হলো, এই রকম অবস্থা চললে আমি পরীক্ষায় গাড্ডু পাবো। আজ রাত থেকে পড়াশুনো না করলে আর নিস্তার নেই। বিকেলবেলা কলেজ ম্যাগাজিনটা অন্য কাগজে মুড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম গঙ্গার ধারে। নিরালায় দাঁড়িয়ে নিজের গল্পের পাতাটা খুললাম। এর আগে অন্তত তিরিশবার পড়েছি। একত্রিশতম বারেও মনে হলো, কি খারাপ লেখা! একটা বাঁদরের হাতে কলম দিলেও বোধহয় সে এর চেয়ে ভালো গল্প লিখতে পারবে।

ম্যাগাজিনটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জলে। দু-এক পলকের মধ্যে সেটা কোথায় মিলিয়ে গেলো। বিদায়, আর ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আর কোনোদিন ওকে মনে স্থান দেবো না।

আমাদের কলকাতার গঙ্গার ধারের সূর্যাস্ত—পৃথিবীর বিখ্যাত দৃশ্যগুলোর অন্যতম। সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আকাশের একটা দিক গনগনে লাল—শেষ রশ্মিগুলো আলাদা আলাদা হয়ে পড়েছে জলে—হঠাৎ একটা স্টিমারের ভোঁ বেজে ওঠে। সব কিছু বিষণ্ণ মনে হয়। কিংবা আমিই শুধু বিষণ্ণ। এই সৌন্দর্যরাশির মধ্যে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, যে থার্ড হয়েছে! থার্ড! যার নিজের যোগ্যতা বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। যারা থার্ড হয়, তাদের জীবনে আর কিছুই হয় না।

সেই সময়কার আকাশের দিকে তাকালে সন্ধ্যাশ্রী আর সূর্যদার নাম মনে পড়বেই। আর এক বিকেলে সন্ধ্যাশ্রীর বাদাম খাওয়া আর সূর্যদার আগমন—সেই উপলক্ষ করেই তো আমার এই অধঃপাত। সন্ধ্যাশ্রী কিংবা সূর্যদার সামনাসামনি গিয়ে কোনোদিন হয়তো ক্ষমা চাইতে পারবো না—তাই সন্ধ্যাকালীন আকাশের দিকে তাকিয়েই আমি বলি, সন্ধ্যাশ্রী, তুমি আমায় ক্ষমা করো। মরীচিমালি সূর্যের

উদ্দেশ্যে আমি বলি, সূর্যদা, ক্ষমা করবেন আমাকে।

মানুষের বদলে প্রকৃতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে এক ধরনের চমৎকার সান্ত্বনা পাওয়া যায়। অন্তত আমি সেদিন পেয়েছিলাম। তাই ঘটনাটা মনে আছে।

## কলকাতার দুই দরজা

সৈন্যবাহিনীর মতো দু দিক থেকে আক্রমণ করে দিনের বেলা হাজার হাজার মানুষ। তারা কলকাতার সমস্ত অফিস-কোর্ট-কাছারি-দোকান-পাটের এক একখানি চেয়ার দখল করে বসে। ব্যাণ্ডেলের পাশের চেয়ারে বেলঘরিয়া, ব্যারাকপুরের পাশে বৈঁচী, ব্যাঁটরার পাশে বেলমুড়ি। 'সৈন্যবাহিনী' বলা ভুল হয়েছে, এঁরা অত্যন্ত নিরীহ, শান্ত, ক্ষীণ চেহারার মানুষ। এঁরা ডেলি প্যাসেঞ্জার। অতি ব্যস্ত ভাবে হাজিরায় নাম সই করবার পর ধীরে-সুস্থে চেয়ারে বসে, গায়ের চাদর বা কোটটি খুলে রেখে—অথবা গরমের দিনে ছাতা কিংবা ছোট থলেটি—শ্রীরামপুর হয়তো লক্ষ্মীকান্তপুরকে বললেন, দাদা, কাল রাত্রে কি ঝড় বৃষ্টি, ঠিক সময় বাড়ি পৌঁছেছিলেন তো?

—ঝড় বৃষ্টি, কাল? সে কি?

—হ্যাঁ—কেন, তুমুল ঝড়-বৃষ্টি!

—বলেন কি দাদা, কাল তো গরমে ছট্‌ফট্‌ করেছি, এক ফোঁটা হাওয়া নেই, বৃষ্টি তো কোন ছার!

পাশাপাশি দুই চেয়ারে কাজ করেন দুজনে একই পোস্টে, একই মাইনে, দুজনে টিফিন খান একসঙ্গে, এক টাকায় ন'টা কমলালেবু কিনে দুজনে আট আনা আট আনা দিয়ে সাড়ে চারখানা লেবু বাড়িতে নিয়ে যান, কিন্তু রাত্তিরে একজন ঘুমুলেন ঝড়-বৃষ্টিতে, আর একজন বাতাসহীন গুমোটে।

শিয়ালদহ এবং হাওড়া কলকাতার দুটি দরজা। দরজা না বলে

বলা উচিত সিংহদ্বার। এই সিংহদ্বার দুটি অবারিত। কখনও বন্ধ হয় না, অবিরাম যাওয়া আসা। যদি কেউ প্রশ্ন করে কলকাতার জনসংখ্যা কত? তখন উল্টে তাকেই প্রশ্ন করতে হবে, দিনের বেলা না রাত্রি বেলা? রাত্রিতে কলকাতায় অবস্থানকারীর চেয়ে দিনের বেলা জনসংখ্যা প্রায় দেড়গুণ বেশী। এই অতিরিক্ত জনস্রোতের আগমন এবং নিষ্ক্রমণের তোরণ এই স্টেশন দুটি।

আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, শিয়ালদহ হল রাজধানী কলকাতার অন্দরমহলের পথ—হাওড়া হল সদরের প্রধান তোরণ। শিয়ালদহের বেশির ভাগ লাইন গেছে, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে —জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে—দুটি মাত্র বাইরের ট্রেন ছাড়ে এখান থেকে। হাওড়ার বেশির ভাগ লাইন বহির্বঙ্গে—দিল্লী-বম্বে-মাদ্রাজ পর্যন্ত। অতিথি, প্রবাসী সন্তানেরা আসে। এই সিংহদ্বার তাই অনেক বেশি সাজানো-ঝকঝকে-আড়ম্বরবহুল। বিদেশীরা হাওড়ায় এলে একেবারে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে না, বিশেষত যখন বেরিয়েই হাওড়া ব্রীজ দেখবে। হাওড়া ব্রীজ আমাদের, কলকাতা বা আশেপাশের লোকদের, চোখে পড়ে না, চোখে সয়ে গেছে। কিন্তু অনেকদিন পর হঠাৎ ঐ বিশাল ইস্পাত অবয়বকে দেখলে চমকে যেতে হয়। বিদেশীদের কাছেও হাওড়া ব্রীজ নিতান্ত সুলভ দৃশ্য নয়। বিশেষত হাওড়া স্টেশন থেকে বার হলেই আচমকা দেখে মনে হয়—কলকাতা যেন আগন্তুকের দিকে স্বাগত দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই তুলনায় শিয়ালদহ অনেক নিষ্প্রভ। পাশ দিয়ে ট্রামে বাসে চেপে চলে গেলেও অনেক সময় চোখে পড়ে না। সেই জন্যই শিয়ালদহকে অন্দরমহলের পথ বলেছি। অন্দরের পথ সাজানো গোছানো থাকবেই বা কি করে! সব সময়ই তো টুকিটাকির জন্য ব্যস্ত-সমস্ত যাওয়া-আসা।

সকালবেলা সাড়ে দশটার আগে এবং বিকেলবেলা পাঁচটার পর এই দুই দরজার দৃশ্য দেখবার মতো। সে দৃশ্য দেখে কে বলবে বাঙালী জাতি অলস। প্রত্যেকের পায়ে এবং মুখে কি প্রচণ্ড গতি! সকালবেলা

ট্রেন থেকে নেমেই ছুট—বাস-ট্রাম ধরতে হবে। একটা-ছুটো বাস এদিক-ওদিক হলেই অফিসে লেট। যতক্ষণ ট্রেনে বসেছিলেন সকলে—কোন উত্তেজনা নেই। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে, বসে, কাত হয়ে,—বড়বাবু, টাইপিস্ট কিংবা লেডি স্টেনো কিংবা টেলিফোন অপারেটর সম্বন্ধে মুখরোচক আলোচনা, অথবা নেহরু-ক্রুশ্চেভ-ফুটবল-ক্রিকেট—অথবা ছেলেটার পরীক্ষা, ওয়াইফের অসুখ—অথবা 'অমুক বইটা মশাই, লাস্ট সীনে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে'—নানান কোণে তাস নিয়েও বসে যান অনেকে। ট্রেন থামামাত্র স্প্রীং-এর পুতুলের মতো সকলে রেডি।

ফেরবার সময় প্রধান ব্যস্ততা বসবার জায়গা নিয়ে। অথবা এমন ভিড় হয় ওঠা যায় না। যাঁরা প্রয়োজনীয় ছু-একটা ছোটখাটো বাজার করেছেন—তাঁদের একটু বসবার জায়গা না হলে চলে কি করে? ফেরার পথে একজন কিনেছেন ফুলকপি—একজন কিনেছেন কয়েকটি বিঘৎ সাইজের কই মাছ। বেলঘরিয়া স্টেশনে এসে কামরার মধ্যে হৈ হৈ কাণ্ড। একজন চেঁচিয়ে উঠলেন, ও দাদা, আমার ফুলকপি নিয়ে নেমে যাচ্ছেন যে। ওটা আমার কপি। হাতে একটা রুমালের পুঁটুলি—কৈ-মাছ ভদ্রলোক ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার ফুলকপি কি রকম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এই বেঞ্চের তলায় একটু রেখেছিলাম। আপনি নিয়ে যাচ্ছেন?

—আপনার ফুলকপি, তার প্রমাণ কি?

—প্রমাণ আবার কি? বৈঠকখানা বাজার থেকে সাত আনা দিয়ে একজোড়া কিনেছি। আশেপাশের লোককে জিজ্ঞেস করুন না—ওঠার সময় আমার হাতে দেখেছে কি না।

—বা, বা, আর আপনি বলতে চান, আমি কই মাছ কিনেছি, আর ফুলকপি কিনিনি? ফুলকপি না দিলে কই মাছের ঝোলে কোনো স্বাদ হয়? আপনি কামরাসুদ্ধু লোককে জিজ্ঞেস করুন।

সব অফিসেই যারা ডেলি প্যাসেঞ্জার তারাই কিন্তু প্রত্যেকদিন ঠিক সময় আসে। কলকাতার লোকদেরই বেশী লেট হয়। এক

হিসেবে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের অবস্থা বড় করুণ। এরা বিকেল কিংবা সকাল বলে কোন কিছু কখনও ভোগ করতে পারে না। সারাদিনই কেটে যায় অফিসে আসবার এবং অফিস করে বাড়ি যাবার তাড়ায়। অনেককে শুনেছি, ঘুম থেকে উঠেই স্নান করে খেতে বসেন—ট্রেন ধরবার জন্য। বাড়ি পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঘোর অন্ধকার।

অনেকদিন পর আমার সঙ্গে শীলা ব্যানার্জির দেখা শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে। বিকেল বেলা। ছেলেবেলায় আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম ভবানীপুরে। কতদিন এক সঙ্গে খেলা করেছি। এখন ওরা চলে গেছে ব্যারাকপুর। আমি চমকে খুশী হয়ে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলুম, শীলা, কেমন আছো?

শীলা প্রথমে চমকে উঠেছিলো। কিন্তু আমাকে দেখার পরই ও হাতঘড়ি দেখলো। এবং চলার গতি না থামিয়ে বললো, অনেকদিন পর দেখা! বাড়ির সবাই কেমন আছে?

আমি বললুম, এসো, ঐ চায়ের দোকানে বসি একটু।

—কিন্তু আমার যে পাঁচটা পনের! শীলা বললো।

—পরে আর নেই? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

—সে অনেক পরে, অনেক দেরি হয়ে যাবে। তা হলে টিউশানিতে যেতে পারবো না। আর একদিন দেখা করবো। আজ চলি।

বোধহয় আমার সঙ্গে দেখা হয়ে দেরি হওয়ার জন্যই ও আরও জোরে হেঁটে গেলো। ছেলেবেলায় শীলাকে দেখতে খুব সুন্দর ছিলো। কিন্তু এই দ্রুত হেঁটে যাওয়ায় ওকে কি রকম কুৎসিত দেখাল। অলস গতিই তো মেয়েদের সৌন্দর্যের লক্ষণ।

তাকিয়ে দেখি—শীলার আশেপাশে আরও কয়েকটি মেয়ে প্রায় দৌড়ুচ্ছে। ওদের এখন আর মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না—মনে হচ্ছে মেয়ে-কেরানী। অমি প্রায় বিরক্ত হতে গিয়েও হতে পারলুম না—যখন মনে পড়লো—ট্রেনের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে যাওয়া কিংবা কাপুরুষ ভিড়ের মধ্যে অস্বস্তিতে যাওয়ার চেয়ে ওদের এই দ্রুতগতি এমন কি-ই বা দৃষ্টিকটু।

## বন্দী মানবক

বছর তিনেকের একটি বাচ্চা ছেলের কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা। রকের উপর বসে আছে। দড়ির আরেক প্রান্ত বাঁধা আছে পিছনের জানলার শিকের সঙ্গে।

না, চোর কিংবা ডাকাত কিংবা ছেলেধরার কারসাজি নয়। প্রকাশ্য দিবালোকে, বাজার যাবার রাস্তায় প্রায় প্রত্যেকদিন সকালে দেখতে পাই। ছেলেটার কপালে একটা সদ্য শুকনো কাটা দাগ দেখে বেঁধে রাখবার কারণটা অনায়াসে বোঝা যায়। অত্যন্ত দুরন্ত এবং বাহিরমুখো ছেলে—কখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে গাড়ি চাপা পড়বে, কখন আছাড় খেয়ে মাথা ফাটাবে—এই সব দেখবার কোন লোক নেই সব সময়ের জন্য, তাই ছেলেটির ব্যস্ত অভিভাবক ওকে বেঁধে রেখে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

রক-ওয়ালা বাড়িটার কাছেই একটা বস্তি। সেখানে অনেক ঝি-চাকর থাকে। এমনও হতে পারে, ঐ শিশু কোন ঝিয়ের ছেলে, মা ওকে বেঁধে রেখে জীবিকার জন্য গেছে। এটা হলেই ভাল হয়, তবু অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা অত্যন্ত পুরনো হয়ে গেছে ভেবে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

আমি শহরের মানুষ, অনেক কঠিন, ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু এমন করুণ দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি। শাসন নয়, শিক্ষা নয়,—কি অবহেলিত, অপমানিত ভাবে বন্দী করে রেখেছে ওকে। মানুষের অনেক শাস্তির কথা শুনেছি, শাস্ত্রে পুরাণে পড়েছি। আগুন চুরির জন্য বন্দী ছিল প্রমিথিয়ুস, গড়ানে পাথর অনবরত তুলতে হয়েছে সিসিফাস্‌কে, হাত বাড়িয়ে কোন কিছু ধরতে না পারার যন্ত্রণায় ভুগেছে ট্যান্টেলাস, পিঁপড়ে মারার অপরাধে দীর্ঘকাল শূলের ওপরে ছিল অন্ধমুনি—কিন্তু সেই সব সচেতন মানুষের শাস্তির চেয়েও অনেক

বেশি কষ্টকর মনে হয় এই শিশুর বন্দীত্ব। এক-একদিন মনে হয়, রোজ মনে হয় না। কোনো কোনোদিন দেখেও অন্যমনস্কভাবে নিজের কাজে চলে যাই। এক-একদিন দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে চুপিসারে ছেলেটির বাঁধন খুলে দিই। বরং ও হারিয়ে যাক, কিংবা মাথা ফাটাক।

এর চেয়ে বরং যে-সব ছেলেরা পথেঘাটে অবৈধ জীবন যাপন করে, নাকি-কান্না কেঁদে ভিক্ষে করে, বিড়ি টানে, সম্পূর্ণ মানে না বুঝে অশ্লীল গালিগালাজ করে—তারাও ভালো আছে' এই দুর্লভ মানবজন্মে তবু তারা সব ক'টা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে যাবে।

রাস্তা দিয়ে মানুষ আসে যায়, ঐ ছেলেটা বন্দী হয়ে থাকে রকের ছোট্ট জায়গাটায়। আকাশে কোনোদিন মেঘ থাকে, কোনোদিন থাকে না, কাছের অশ্বত্থ গাছটায় কখনো এক ঝাঁক পাখি বসে, কখনো বসে না, ছেলেটা চুপ করে বসে থাকে। ওর জন্য মায়ের কোল নেই, একটা সঙ্গী পর্যন্ত নেই। কোনোদিন দেখি, হাতের একটা বিস্কুট উদাসভাবে অল্প অল্প কামড়াচ্ছে, কোনো কোনোদিন আপন মনে দুর্বোধ্য ভাষায় ওকে কি সব বলতে শুনি, কখনও বা দেখি দড়িটা যতদূর সম্ভব টান করে রক থেকে ঝুঁকে পড়বার চেষ্টা করছে, আবার এক-একদিন দেখি ধুলোর মধ্যে কাত হয়ে ঘুমিয়ে আছে, কষ বেয়ে লালা পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। কি ক্লান্ত ওর সেই ঘুমন্ত ভঙ্গি!

ছেলেটার কোমরে দড়ির দাগ পড়েছে কিনা দেখতে ইচ্ছে হয়। যদিও না দেখলেও জানি, দাগ পড়েছে। এই দড়ির বাঁধন ওর অভ্যেস হয়ে যাবে। ও আর কোনোদিনই এগুতে পারবে না। দেশের জন্য কিংবা কোনো মহৎ আদর্শের জন্য বেপরোয়া হতে পারবে না, দুঃসাহসিক প্রেমে পরাঙ্মুখ হবে। যদি শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যায় গণ্ডি ছাড়াতে পারবে না। বিশাল জীবনের স্পর্শ পাবে না। ওর জীবন হবে সাধারণ, অতি সাধারণ, ওর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়বে ভীরুতা যা সব সময় ওকে পিছন দিকে টান দেবে।

পার্কে ঝকঝকে ডালিয়া আর চন্দ্রমল্লিকা ফুলগুলির মধ্য দিয়ে ছুটোপুটি করছে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। সহাস্য বয়ানে ডিসপেপ্‌টিক

বৃদ্ধেরা হাওয়া খেতে এসে ওদের খেলা দেখছে। বর্ষার ক্ষণরোদ্দুর ঝল্‌মল্‌ করছে আর মাঝে মাঝে খল্‌খল্‌ করে হাসছে। বাচ্চাদের নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিয়ে এ বাড়ির চাকর রসালাপ করছে ও বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে।

ঐ পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে আমি বাড়ি ফিরছিলাম। আরও কিছুটা হেঁটে এসে দেখলাম সেই ছেলেটা ঘুমিয়ে রয়েছে। চোখে জল, বুঝি একলা কিছুক্ষণ কেঁদেছিলো, একটা হাত ঝুলে রয়েছে বাইরে। ওর মা কিংবা বাবা কিংবা মাসি-পিসি-খুড়ো-জ্যাঠা কিংবা কে-সেই-লোকটা আমি জানি না, ওকে এখনও ঘরে নিয়ে যায়নি।

একদিন দেখলাম, একটা কুকুর ওর সামনে ঘেউ ঘেউ করছে। বিলিতি কুকুর—এবং কুকুরের মালিক চেন ধরে কুকুরটাকে টেনে রেখে হাসছে, মজা দেখছে। ছেলেটাও বেশ ডানপিটে, একটুও ভয় পায়নি। দড়িটা সবটুকু টেনে রক থেকে ঝুঁকে পড়ে বলছে, লাত্তি, লাত্তি মারব, দূরঃ, দূরঃ···

কুকুর কিংবা শিশু কেউই বাঁধনের বাইরে আর এগুতে পারছে না।

## কলকাতার খিদে মেটাতে চালের চোরা-চালান

বছর খানেক আগে বৈঁচি স্টেশনে আমি একটি দৃশ্য দেখেছিলাম। প্ল্যাটফর্মের দু-পাশে দুটি ট্রেন, এক ট্রেনের সব লোক বিহ্বল চোখে অন্য ট্রেনটির দিকে চেয়ে আছে। অনেকে দৌড়ে যাচ্ছে সেদিকে। এত ভিড় সত্ত্বেও দেখতে অসুবিধে হয়নি একটি ই এম ইউ কোচের ছাদে একটি আঠারো-উনিশ বছরের যুবক হাঁটু গেড়ে দু'হাত ছড়িয়ে দৌড়ের ভঙ্গিতে বসে আছে। যেন সে ট্রেনের ছাদ থেকে আকাশে উড়তে চেয়েছিলো। কিন্তু সে তখন সম্পূর্ণ স্থির, মৃত্যু তাকে ছুঁয়ে গেছে পাঁচ মিনিট আগে। হাই ভোল্টেজ তারের স্পর্শে সে আটকে গেছে, তার শরীরটা ছাইয়ের মতন ফ্যাকাসে। তখনও তার মাথা দিয়ে ধোঁয়া

বেরুচ্ছিল, চট চট শব্দে চুল পুড়ছে।

হাজার হাজার লোকে দেখছিলো সেই ছেলেটিকে, কিন্তু কারুর কিছু করার উপায় ছিলো না। ছেলেটির ছড়ানো দু'হাতে দুটি চালের বস্তা। রেল-পুলিসের তাড়া খেয়ে ছেলেটি ঐ ট্রেন টপকে এদিকে আসবার চেষ্টা করছিলো।

দৃশ্যটি দেখে আমরা শহুরে কয়েকজন যতটা স্তম্ভিত হয়েছিলাম, অন্যান্য ডেলি-প্যাসেনজাররা ততটা হননি। তাঁদের কাছে এ সব অনেকটা গা-সহা। চলন্ত ট্রেনে গোরু-ছাগল কাটা পড়ার চেয়েও স্মাগলার কাটা পড়া ইদানীং অনেক স্বাভাবিক ঘটনা। এমারজেনসি আমলে স্মাগলার কাটা পড়লেও কোনো ট্রেন লেট হয়নি।

সেই ভিড়ের মধ্যে একটি দশ-এগারো বছরের হা-ঘরে ছেলে,—প্রত্যেক স্টেশনেই এরকম কিছু ছেলে থাকে, যাদের বলা যায় রেলের আগাছা, সে হঠাৎ বলে উঠেছিলো, ঐ চালগুলো কী হবে? কেউ খাবে না?

মনে হয়েছিলো, সেই ছেলেটিই একটি খাঁটি সৎ ও আন্তরিক কথা বলেছে। মানুষের জীবনের চেয়ে চালের দাম বেশি। সত্যিই কি ঐ চাল কেউ খাবে না? ফেলে দেওয়া হবে দু বস্তা চাল? বিশ্বাস করা শক্ত। অন্য কারুর হাতে সেই চাল নিশ্চয়ই পাচার হয়ে যাবে কলকাতা শহরে। সেই চালের ভাত খেতে খেতে কেউ কি আর একটা মরা-যুবকের গায়ের গন্ধ পাবে তার থেকে? এত শৌখিন নাক আজকাল কার আছে?

সেই বৈঁচি স্টেশনে আবার গেলাম কাল। কারুর কি মনে আছে সেই ছেলেটির কথা? প্ল্যাটফরমের লোকজনদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, হ্যাঁ, ঘটনাটা মনে আছে। ছেলেটির নাম? না, নাম কেউ জানে না। একজন আঙুল উঁচিয়ে বললেন, ঐ যে দেখুন, ওরা দাঁড়িয়ে আছে, ওদের কি নাম কেউ জিজ্ঞেস করে?

কোলে কাঁখে নিজের সন্তানকে বয়ে নেওয়ার ভঙ্গিতে চালের বস্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন স্ত্রীলোক। তেরো থেকে তিপ্পান্নর মধ্যে

বয়েস। সারা শরীরে ধুলো মাখা। মাথার চুল রুক্ষ। ওদের চেহারা দেখলেই চেনা যায়। চাল-চোরাচালানীদের একটা আলাদা জাত তৈরি হয়ে গেছে গত কয়েক বছরে।

আগামীকাল থেকে প্রায় লাখ খানেক বালক ও স্ত্রীলোক বেকার হলো। এরা কোনো চাকরিতে যুক্ত ছিলো না। এরা নিযুক্ত ছিলো, আইনের চোখে, একটি অপরাধমূলক কাজে। সরো দেশে আবার অবাধ চাল চলাচল হবে, উঠে গেলো করডনিং, এখন ব্যবসায়ীরা ওয়াগন বোঝাই করে বা ট্রাকে চাল নিয়ে যাবে, ঐ ধুলো-মাখা বালক ও স্ত্রীলোকেরা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেলো। এদের সংখ্যা ঠিক কত তা নির্ধারণ করার কোনোই উপায় নেই, কারণ কারবারটা ছিলো গোপন। আমি লাখ খানেক বলেছি, কিন্তু বলতে ইচ্ছে হয় লাখ লাখ। হাওড়া-শিয়ালদা লাইনে কলকাতাগামী প্রত্যেকটি ট্রেনে এরা পিলপিল করে।

স্মাগলার বলতে হে দুর্ধর্ষ জাঁহাবাজ প্রাণীদের কথা আমাদের মনে পড়ে, চাল-স্মাগলারদের সঙ্গে তাদের কোনো মিল নেই। এরা গ্রাম-বাংলার সাধারণ বাড়ির বউ-ঝি, ছেলেপুলে। বহুবার দেখেছি, ইঁদুরের মতন এরা এদিক-ওদিক দৌড়োচ্ছে। করডনিং করে এই ক বছরে কতটা সুফল পাওয়া গেছে, আমি তা জানি না। কিন্তু দেখেছি, এই একটি নির্দেশ জারি করার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে গ্রামের হাজার হাজার পরিবারের সাধারণ নারী-পুরুষ ভ্রষ্ট নষ্ট হতে লাগলো। এরা সবাই জানে, এরা একটা বে-আইনী কাজ করছে, এদের একমাত্র উদ্দেশ্য পুলিসকে ফাঁকি দেওয়া। এরা রাজি হলো ট্রেনের কামরায় মানুষের পায়ের তলায় শুয়ে থাকতে। এরা বাধ্য হলো।

কলকাতা শহরে একজন ভিখিরিরও ক্রয়-ক্ষমতা আছে। সুতরাং কলকাতা শহরে চাল আসবেই। পয়সা থাকতেও কলকাতা শহরে কেউ চাল কিনতে পারেনি, এমন একটা দিনও যায়নি। রেশনিং ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিদিন দু-বেলা ভাত খাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু যাদের টাকা আছে, তারা যদি প্রতিদিন দু-বেলা চীনে হোটেলে গিয়ে ফ্রায়েড রাইস খায়, তাদের কে আটকাচ্ছে? টাকার কাছে কোনো আইনই

কিছু না। যাই হোক, কলকাতার এই বিরাট হাঁ-করা মুখের খিদে মেটাবার জন্য প্রচুর বে-আইনী চালের প্রয়োজন। এটা একটা বিরাট ব্যবসা। সুতরাং বড় বড় ব্যবসায়ীরা নেমে পড়েছিলো এই কাজে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে মারোয়াড়ীরা (হ্যাঁ, এখানেও মারোয়াড়ী) গেরস্ত ঘরের বউ-ঝিদের টাকা দাদন দিয়ে বাইরে টেনে এনেছে। এরা সেই চলের বাহক মাত্র। অথচ প্রত্যেক চেক পোস্টে, প্রতিটি রেল-স্টেশনে আছে পুলিস।

হ্যাঁ, পুলিস। এত বড় একটা বিরাট বে-আইনী কারবার পুলিস দিয়ে আটকানো যাবে, একথা আমাদের সরকার বাহাদুর ভেবেছিলেন সত্যি ? সরকার বাহাদুরের বুদ্ধিকে বলিহারি যাই। সোনারপুর স্টেশনে তিনটি স্ত্রীলোককে হাপুস নয়নে কাঁদতে দেখেছি। না, তাদের কোনো আত্মীয় মারা যায়নি। পুলিস তাদের চাল কেড়ে নিয়ে গেছে। ডিউটি শেষে পুলিস-কনস্টেবল সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরছে, দু-পাশে ঝুলছে দুটি চালের বস্তা, এ দৃশ্য আমি বহুবার দেখেছি। পুলিস চাল সঙ্গে নিয়ে গেলে কেউ তাদের ধরবার নেই। স্ত্রীলোক তিনটি অবিকল পুত্রবিয়োগের মতনই কাঁদছিলো, কিন্তু তাদের মড়া-কান্নার ভাষা ছিলো এই, 'ওগো, মালিকের কাছে পঁয়তাল্লিশ টাকার দেনা কী করে শুধবে গো।'

চাল কেড়ে নেওয়া, ঘুষ, এ ছাড়াও পুলিস আরও অনেক দূর এগিয়েছে। যে-সব স্ত্রীলোক আগে ঘোমটা না দিয়ে বাড়ির বাইরে বেরুতো না, তারা যখন একবার ট্যাঁকে চালের বস্তা গুঁজে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগলো, তখন আর মান-সম্মান বজায় রাখার প্রশ্ন ওঠে না। ছেলেরা ধরা পড়লে মার খায়, আর মেয়েরা ধরা পড়লে তাদের রেল-লাইনের পাশের ঝোপে নিয়ে যাওয়া হয় জেরা করবার জন্য। প্ল্যাটফরমের ওপরেই যুবতী চাল-চোরচালানীর শরীর লুট হয়। (যদি কেউ মনে করেন যে আমি এখানে ইচ্ছে করে আদিরস দেবার চেষ্টা করছি, তবে আরও স্পষ্ট করে জানাই, গতকাল, বৃহস্পতিবার, বেলা ঠিক একটা বেজে পাঁচ মিনিটে উলুবেড়িয়া স্টেশনের প্ল্যাটফরমে

একজন কালো কোট পরা রেল-কর্মচারী একটি যুবতী চাল-চোরা-চালানীর দিকে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ব্লাউজ খিমচে ধরে ঝাঁকাচ্ছিলেন। তখন সেখানে অনেক লোক এবং ঠিক সেই মুহূর্তে খড়্গপুর লোকাল ঝমঝম করে বেরিয়ে গেলো, প্রতিটি কামরার জানলা দিয়ে হাজার হাজার লোক দেখলো। দৃশ্যটা আদি-রসাত্মক নয়, বীভৎস।)

কোলাঘাট রেল-স্টেশনে এক বৃদ্ধা চালের বস্তাটা থেকে খানিকটা দূরে উবু হয়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে বসে ছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই চাল আপনার? সে অমনি কেঁপে উঠে বললো, চাল নয় বাবু, কুঁড়ো, ওতে কুঁড়ো রয়েছে।

বস্তাটা টিপে দেখলাম। কোনো ভুল নেই। বললাম, আমি রেলের লোকও নই, পুলিসের লোকও নই। এমনি প্যাসেনজার। আমাকে ভয় পাবার দরকার নেই। এমনি জিজ্ঞেস করছি। এই চাল কোথায় যাবে?

বৃদ্ধা মুখ নিচু করে বললো, রামরাজাতলা। তার উচ্চারণে নামটা শোনায় 'ড়ামড়াজাতল্লা'। জিজ্ঞেস করলাম, সেখানে কি এই চাল আপনি নিজে বিক্রি করবেন?

না, সেখানে অন্য লোক আছে। সে নিয়ে যাবে।

আপনার কত লাভ হয়? আপনাকে কত দেয়?

দু' টাকা।

## চালের চোরাচালানীরা ভাত খায় না

চারজন লোক একটা খাটিয়া নিয়ে ছুটছে আর হরিবোল দিচ্ছে বার বার, তারপর জেলা-সীমান্ত পার হবার পর খাটিয়া নামানো হলো, দেখা গেলো সেখানে কোনো মৃতদেহ নেই, রয়েছে জীবন ধারণের জন্য কয়েক বস্তা চাল। এসব গল্পকথা নয়। কড়াকড়ির প্রথম দিককার ঘটনা এসব। তখন চাল পাচারকারীরা জেলা ভ্রমণ করেছে অনেক সন্তর্পণে,

অনেক সময় গভীর রাত্রে, কিংবা নৌকোয় জলপথে। চালের চলাচল নিষেধ কিন্তু ভাত নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ নয়। তাই চাল একবার ফুটিয়ে ভাতের মতন চেহারা দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে হাঁড়ি ভর্তি করে, আবার শুকিয়ে সেগুলি চাল হয়ে গেছে। ট্রেনে তখন সীটের তলায় পা দিয়ে হঠাৎ চমকে উঠেছে যাত্রীরা, সেখানে কুঁকড়েমুকড়ে শুয়ে থাকতো বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। তারপর কারবার যখন ফলাও হলো, লাজলজ্জা সব ঘুচে গেলো। চাল-চালানীরা বেরিয়ে এলো প্রকাশ্যে, ট্রেনে তারা ঠেলাঠেলি করে যাত্রীদের সরিয়ে নিজেরা জায়গা দখল করে নিতে লাগলো। এমন কি যাত্রীদের সঙ্গে চাল-চালানীদের খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে বেশ কয়েকবার। ট্রেনের ছাদ ফুটো করে ওপর থেকে চালের বস্তা নামানো হচ্ছে, দেখা গেছে এমন দৃশ্যও। শিয়ালদার দিকের ট্রেন উল্টো-ডাঙ্গার একটু আগে আপনি আপনি গতি মন্থর করে দেয়, ধুপধাপ করে বাইরে পড়তে থাকে চালের বস্তা, তারপরই শুরু হয় নানারকম তৎপরতা সবার চোখের সামনে। প্রতিদিনই এরকম হয়, সবাই জানে, ইংরেজিতে একেই বলে উন্মুক্ত গোপন।

পরশুদিন রূপনারায়ণের বুকে নৌকো নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নানান গল্পের ফাঁকে আমি কিশোর মাঝিটিকে জিজ্ঞেস করলাম, এদিকে এখন নৌকোয় চাল যায়? এখন মাছ ধরার জোরালো সময়। নদীর বুকে মোচার খোলার মতন অসংখ্য নৌকো ভাসছে। ডুবিয়ে রাখা জালগুলোর মাথায় সাদা নিশান, সবাই উদগ্রীব ইলিশের জন্য। কিশোর মাঝিটি বললো, আগে যেতো, এখন আর যায় না। এখন সব নৌকো মাছ ধরার কাজে লেগেছে। তাছাড়া একবার পুলিসের এস পি সাহেব এক দঙ্গল পুলিস এনে জেলেদের ওপর হামলা করলেন···

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এখন কি আর কেউ এখান থেকে চাল চালান দেয় না?

এপারে মেদিনীপুর, ওপারে হাওড়া। রেল ব্রীজের ওপর দিয়ে মেল ট্রেন যাচ্ছে। ছেলেটি সেদিকে তাকিয়ে বললো, দেয়, তবে রেলেই বেশি সুবিধে বাবু।

হ্যাঁ, রেলেই বেশি সুবিধে। অনেক পরীক্ষার পর চাল-চালানীরা এটা বুঝেছে। রেলে সবচেয়ে খরচ কম। রেলে টিকিটও কাটতে হয় না, একসঙ্গে এক কামরায় পঁচিশ-তিরিশজন থাকে বলে অপারেশনও সহজ।

কোনো সামাজিক সংস্কার শুধু আইন করে হয় না। জনসাধারণের সহযোগিতা দরকার। চালের কালোবাজার রোধ করবার জন্য জেলা করডনিং। তবু কেন জনসাধারণ কোথাও কখনো এই চাল-চোরা-চালানীদের বাধা দেয়নি? পুলিস যখন কোনো মেয়ের চালের থলি কেড়ে নিয়েছে কিংবা কোনো ছোট ছেলেকে মেরেছে, তখন বরং কয়েকবার জনসাধারণ পুলিসকেই বিদ্রূপ করেছে। কেন? সাধারণ মানুষের চোখে সাধারণ পুলিস মাত্রই ঘুষখোর আর চালের চোরা-চালানীরা নিছক গরীব আর অসহায়।

চিনির বলদ কখনো চিনি খায় না। প্রতিদিন এই যে সব স্ত্রীলোক ও বালকরা চাল বয়ে নিয়ে এসেছে, এরা নিজেরা ভাত খায় কদাচিৎ। ভাত এদের কাছে অতি দুর্লভ বস্তু, সপ্তাহে এক বেলার বেশি জোটে না। নিজস্ব কৌতূহলে আমি এদের সঙ্গে অনেক বার কথা বলে দেখেছি। এরা ভাত খায় না, খেতেও চায় না। এক কিলো চাল বেচলেই ষাট-সত্তর পয়সা লাভ, সেই চাল কি ওরা প্রাণে ধরে মুখে তুলতে পারে।

কিছুদিন আগে আমি বারুইপুর লাইনে পনেরো-কুড়িজন চাল-চালানীর গণ-আহারের দৃশ্য দেখছিলাম। তারা তাদের চালের বস্তা নিরাপদে পার করে দিয়ে প্রসন্ন মনে বাড়ি ফিরছে। রেল-কামরার মেঝেতে ওরা বসেছে এ ওর পিঠে ঠেস দিয়ে, নারী পুরুষের কোনো বাছবিচার নেই, কেউ কেউ পা ঝুলিয়ে দিয়েছে বাইরে। কোনো এক স্টেশনে ওরা সবাই এক পাঁউরুটি-ওয়ালাকে ডেকে এক কোয়ার্টার করে পাঁউরুটি কিনলো। দাম চার আনা। ওরা কিন্তু শুধু পাঁউরুটি খায় না। তার সঙ্গে কিনলো এক বোতল সোডা। এই রকম সোডা আমরা কেউ কখনো দেখি না, শুধু লোকাল ট্রেনেই এগুলো

পাওয়া যায়। দাম দশ পয়সা। ছিপি খুললে ফটাশ করে শব্দ হয় এবং ভুসভুস করে গ্যাস বেরোয় পর্যন্ত। এরা নীট পাঁউরুটি খায় না। তার সঙ্গে সোডা চাই। আঙুল দিয়ে—পাঁউরুটিটা ফুটো করে তার মধ্যে সোডা ঢেলে দেয়, তারপর পাঁউরুটিটা দু'হাতে নিয়ে পাকায় খানিকক্ষণ। এর পর এক কামড় করে পাঁউরুটি খায়, বোতল থেকে এক এক ঢোঁক সোডা গলায় ঢালে। রীতিমতন তৃপ্তির সঙ্গে ওরা আহার শেষ করলো। মোট পঁয়তিরিশ পয়সা। টুকো রস লাঞ্চ। চালের করডনিং আজ থেকে উঠে যাবার কথা। তা হলে, আশা করা যায়, চালের চোরা-চালান এবার বন্ধ হবে। ট্রেনগুলি পরিচ্ছন্ন হবে, পুলিসরা সৎ হবে। তখন এই লাখ খানেক চোরা-চালানী কোথায় যাবে? এদের রোজগার হঠাৎ বন্ধ হলে এরা কি শান্তভাবে ঘরে ফিরে গিয়ে বসে থাকবে পেটে কিল মেরে? এরা একবার অন্যায়ের পথ চিনেছে। এরা জেনেছে পুলিসকে কীভাবে ফাঁকি দিতে হয়। ছোট ছোট বাচ্চারাও লাথি-কিল-লাঠির বাড়ি খেয়ে শক্ত করে ফেলেছে গায়ের চামড়া। মেয়েরা একবার দু'বার সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে সম্ভ্রমের আর পরোয়া করে না। এরা একা একা বাইরে বেরুতে শিখেছে, দেখেছে পুরুষের লালসামাখা চোখ ও হাত। এরা আর কেউ নিরীহ নয়, এরা বিপদকে ভয় করে না, এরা কি সহজে মেনে নেবে বেকারত্ব?

অথবা পশ্চিম বাংলায় আরও লাখ খানেক ছিঁচকে চোর ও বার-বনিতা বাড়বে? বাড়ছে?

## সুখের পটভূমিকা

আমি একদিন দু-তিন মিনিটের জন্য চোর হয়েছিলাম। গোছা গোছা টাকা চুরির জন্য হাত বাড়িয়েছিলাম আমি। পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশাটির মূল কুযুক্তি আমি উপলব্ধি করেছিলাম সেই একটু সময়ের মধ্যেই।

তখন আমার বেকারত্বর দেড় বছর পূর্ণ হয়েছে। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'দিক দিয়ে বড় রাস্তায় পড়া যায়, সেই দু'দিকেই দু'টো সিগারেটের দোকানে প্রচুর ধার করে ফেলেছি, বাড়ি থেকে বেরুলেই মুশকিল। দু-তিন দিন অন্তর দাড়ি কামাই, তাও ব্লেডের পয়সা জোটানো এক কষ্টকর ব্যাপার। বাবার প্রায়ই হার্টের দোষ দেখা দেয়, ছুটি নিতে নিতে হাফ-পে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, সংসারে রোজ টানাটানি, সেই সময় আমি একটা সুস্থ সবল ছেলে, অনেক পয়সা ও পরিশ্রম খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী যোগাড় করেছি, অথচ এক পয়সা রোজগার নেই—লজ্জায় কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারি না।

হঠাৎ এক বন্ধুর দৌলতে একটা কাজ পেয়ে গেলুম। চাকরি নয়, টিউশানি, কিন্তু চাকরিরই মতন প্রায়, একটি মেয়েকে বাংলা শেখাতে হবে রোজ সন্ধ্যেবেলা, মাইনে একশো টাকা। মেয়েটি তার বাবা মায়ের সঙ্গে বিলেতে আমেরিকায় কাটিয়েছে বহুদিন, তাই বাংলা না-জানার জন্য তার লজ্জা হয়েছে, আমি তো খুশিতে ডগমগো, আমারই পাড়ার একটা ছেলে ক'দিন আগে একটা কেরানীগিরি পেয়েছে, দুশো সাতান্ন টাকা মাইনে তাতেই সে রোজ গর্বের সঙ্গে সেজেগুজে অফিসে যায়—আর আমি শুধু সন্ধ্যেবেলা একটু সময় পড়িয়েই একশো টাকা পাবো! পুরো একশো টাকা!

একটা ব্যাপারে শুধু অস্বস্তি রইলো। ছাত্রীর বদলে ছাত্র হলেই আর একটু ভালো হতো। ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করার কোনো চিন্তাই আমার মাথায় আসেনি। আমি শুধু ভাবতুম একটি যুবতী মেয়ের সামনে রোজ বসতে গেলে জামা-কাপড়টাপড় একটু পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত, না হলে বড় লজ্জা লাগবে। কিন্তু তখন রোজ পাটভাঙা জামা-প্যান্ট পরার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। দাড়িও কামাতে হবে রোজ। ছাত্র হলে এতটা খুঁতখুঁতুনি না থাকলেও চলতো

কিন্তু এর চেয়েও আর একটা বড় অসুবিধে দেখা গেল। থাকি শ্যামবাজারে, পড়াতে যেতে হবে নিউ আলিপুরে—প্রত্যেকদিন ট্রাম-বাস ভাড়া যোগাড় করবো কি করে? মাইনে পাবো এক মাস বাদে,

কিন্তু সেই প্রথম এক মাস চালাবো কোন্ মন্ত্রবলে? বন্ধুদের কাছ থেকে সিগারেট জক্ মেরে খাই, কিন্তু তাদের কাছে তো পয়সা চাওয়া যায় না। বাড়িতে টিউশানি পাবার কথাটা চেপে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, প্রথম দু-এক মাস মাইনে পেয়ে ধারটার শোধ করে তারপর না হয় জানাবো।

আমাদের পাশের বাড়ির প্রতাপদার ছিল ট্রামের মান্থলি টিকেট, বিকেলে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে তিনি আর বেরুতেন না। অনেক কাকুতি-মিনতি করে তাঁর কাছ থেকে মান্থলি টিকিটখানা প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলা ধার নেবার ব্যবস্থা করলুম। এতে শ্যামবাজার থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত আমার একটা সুরাহা হলো, কিন্তু সেখান থেকে নিউ আলিপুর? হেঁটে আসা যায় না। গরমের দিন, অতখানি রাস্তা হেঁটে এলে ঘামে জামার অবস্থা বিতিকিচ্ছিরি হয়ে যায়। কি উপায়ে রোজ সেই পয়সা যোগাড় করতুম তা বেকার ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারবে না।

সেই সময়েরই একদিনের ঘটনা। ছাত্রীটি বেশ বুদ্ধিমতী, মোটেই চালিয়াৎ নয়, বাড়ির লোকজনও বেশ ভালো, চায়ের সঙ্গে রোজই নানারকম খাবার আসে। আমার সঙ্গে সবাই বেশ সম্মান করে কথা বলে। আমিও এমন ভাব দেখাই, যেন নেহাৎ শখ করেই আমার টিউশানি করতে আসা—টাকা-পয়সার কথা নিয়ে আমি কোনোরকমই মাথা ঘামাই না। ছাত্রীর বাবা প্রায়ই আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেন, অনেক রাত হয়ে যায়।

একদিন কথায় কথায় রাত দশটা বেজে গেছে। সেদিন শুধু গল্পের জন্য নয়, দারুণ বৃষ্টিতে বেরুতে পারিনি। ছাত্রীর বাবা অবশ্য আশ্বাস দিয়েছিলেন বৃষ্টি যদি না থামে, তিনি আমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দেবেন, কিন্তু বৃষ্টি থামার পর তিনিও আর কিছু বলেননি, আমিও বলিনি।

নির্জন রাস্তা, বাস বন্ধ হয়ে গেছে কিনা ঠিক নেই, পকেটে একটি মাত্র সিকি, হাত দিয়ে সেটাকে সারাক্ষণ চেপে ধরে আছি। সিগারেট খাওয়ার জন্য বুকের ভেতরটায় ছটফট করছে, কিন্তু সিগারেট কিনে খাওয়ার অভ্যেস একেবারেই ত্যাগ করেছি। এই সিকি থেকে পয়সা

বাঁচিয়ে রাখতে হবে কালকের জন্য। এই সময় দূরে একটা বাস দেখা গেল, আমি উঠে কণ্ডাক্টরের থেকে অনেক দূরে গিয়ে বসলুম। বাসে ভিড় নেই, ভিড়ের বাসে তবুও যদিবা টিকিট ফাঁকি দেবার সুযোগ পাওয়া যায়, আজ আর কোনো আশাই নেই।

কণ্ডাক্টার এসে টিকিট চাইতেই আমি সিকিটা বাড়িয়ে দিলাম। উদাসীনভাবে বললাম, এস্প্ল্যানেড। লোকটা সিকিটা নিয়ে ব্যাগে ফেলতে গিয়েও তুলে ধরলো, উঁচু করে কি যেন দেখলো, তারপর হাতের তালুতে ঘষে, আমার চেয়েও উদাসীন গলায় বললো, বদলে দিন, এটা অচল।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। অচল? অচল কথাটার মানে কি? এরকম একটা অর্থহীন শব্দ যেন জীবনে কখনো শুনিনি। বিহ্বল গলায় বললাম, কি বলছেন?

—সিকিটা অচল।

—অচল কেন?

—তা আমি কি করে বলবো! যে বানিয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করুন। এ তো খাঁটি সীসে। বদলে দিন।

যন্ত্রের মতো হাত বাড়িয়ে আমি সিকিটা নিলাম। আশ্চর্য, আমি এতই বোকা, আগে লক্ষ্যই করিনি, সিকিটা সত্যিই ডাহা জাল! এই টানাটানির সময় এই রকম মতিভ্রম?

—কই, অন্য সিকি দিন।

—আমার কাছে আর পয়সা নেই।

—আর পয়সা নেই! শুধু এই অচল সিকি নিয়ে উঠেছেন? ভেবেছেন এই রাত্তির বেলা গছিয়ে দেবেন? বার করুন আর কি আছে!

অপমানে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। বাসের সব লোক এদিকে চেয়ে মজা দেখছে। আমার প্রায় কান্না এসে যাচ্ছিলো। এরা কেউই বিশ্বাস করবে না, সত্যিই আমি জানতুম না, ওটা অচল। অভিমানী গলায় আমি বললুম, ঠিক আছে আমি নেমে যাচ্ছি।

কণ্ডাক্টর চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, তা তো যাবেনই! জামা-কাপড় তো ভদ্দরলোকেরই মতন। আজকাল দেখলে কারুকে বোঝা যায় না —কে ভদ্দরলোক আর কে জোচ্চোর।

সব অপমান গায়ে মেখে আমি বাস থেকে নেমে পড়লাম। ইচ্ছে হলো রাস্তার ওপর বসে থাকি। কিংবা কোনো চলন্ত গাড়ির তলায় মাথা পেতে দিই। কিন্তু এসব ইচ্ছে বেশিক্ষণ থাকে না। বাড়ি ফেরার চিন্তা প্রবল হয়ে উঠলো। এখানে বেশি দেরি হলে আবার এস্‌প্ল্যানেড থেকে লাস্ট ট্রাম চলে যাবে—তাহলে এতটা রাস্তা হেঁটে বাড়ি ফিরতে রাত শেষ। বাবা নির্ঘাৎ পুলিসে খবর দেবেন। কি করি এখন?

যা থাকে কপালে,—বলে একটা দোতলা বাসে উঠে পড়লাম রাসবিহারী মোড় থেকে। কণ্ডাক্টর এলে হাতে পায়ে ধরে বুঝিয়ে বলবো, আমার পকেটে একটা সিকি আছে, সেটা অচল আমি জানতাম না— আমাকে বিনা পয়সায় যেতে দিন। হয়তো তার দয়া হতেও পারে। সব মানুষই তো আর খারাপ হয় না। অচল সিকি আবার চালাবার চেষ্টা করবো না।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেছি, ওপর তলায় একেবারে শেষ সিঁড়িতে আমার পায়ে কি যেন লাগলো। তাকিয়ে দেখি একটা পেট-মোটা মানিব্যাগ। কুড়িয়ে নিলাম। কিছু না ভেবেই সেটা খুলে দেখতে গিয়ে আমার চোখ ঠিকরে আসবার উপক্রম। ব্যাগটার মধ্যে থরে থরে সাজানো একশো টাকার নোট, আগেকার সেই বড় সাইজের নোট— চিনতে ভুল হয় না। এক নজর দেখেই বুঝতে পারলুম অন্তত তিন-চার হাজার টাকা, কিছু খুচরো দশ-পাঁচ টাকার নোটও আছে, কয়েকটা কার্ড, একটা ছবি, আর একটা সোনা বাঁধানো জিনিস—অনেকটা মেয়েদের ব্রোচের মতন।

আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা ঠাণ্ডা স্রোত খেলে গেলো। আমার হাতের মুঠোয় চার হাজার টাকা, এই টাকা পেলে একটু আগে যে অপমান সহ্য করেছি, সে-রকম সব কিছুর প্রতিশোধ নিতে পারি। আমার জীবনের রং বদলে যেতে পারে। উঃ চার হাজার টাকা।

উত্তেজনায় আমার শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগলো। ব্যাগটা হাতে নিয়ে আমি তাকিয়ে দেখলাম, দোতলায় অল্প কয়েকজন মাত্র লোক বসে ঝিমোচ্ছে, আমাকে লক্ষ্য করেনি, কণ্ডাক্টর নিচে দাঁড়িয়ে গল্প করছে তার পার্টনারের সঙ্গে।

কয়েক সেকেণ্ড সেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। সেইটুকু সময়ের মধ্যে আমার মধ্যে—এত বছরের মানব-সভ্যতার ইতিহাসে যতটুকু উন্নতি ও অবনতি হয়ে কি কি উচিত, ব্যাগের ভেতরে কার্ডের নাম দেখে, আমি যাত্রীদের জিজ্ঞেস করতে পারি—এটা তাদের কারুর কিনা। উপযুক্ত প্রমাণ দিলে ফেরত দেওয়া উচিত। কিংবা থানায় জমা দেওয়া যায়, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া যায়। কিন্তু এসব ছাড়িয়ে একটা কথাই আমার মধ্যে প্রধান হয়ে উঠলো, যদি আমি একবার বাস থেকে নেমে পড়তে পারি—তা হলে এ টাকা আমার। এতগুলো টাকা!

কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, অন্য যাত্রীরা হয়তো আমাকে লক্ষ্য করেনি। মন স্থির করে আমি চটপট নেমে এসে বাসের গেটের কাছে দাঁড়ালাম।

ময়দানের পাশ দিয়ে বাস ছুটেছে, ফাঁকা রাস্তা, দুর্দান্ত স্পীড। এখানে স্টপগুলোও অনেক দূরে দূরে। আমার বুকের মধ্যে দুম্ দুম্ শব্দ হচ্ছে, হাত কাঁপছে থর থর করে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছি না। আর এক কি আধ মিনিট—বাস থামলেই লাফিয়ে নেমে পড়বো। একবার রাস্তার লোকদের মধ্যে মিশে গেলে···এখন আমার পকেটে বাসের ভাড়াও নেই, কিন্তু আমি এক্ষুনি ট্যাক্সি চাপবো! বাসটা কখন থামবে? এত জোরে ছুটছে যে নামতে গেলে আমার হাত পা ভেঙে যাবে! আর কটা মুহূর্ত···

এমন সময় সিঁড়িতে দুপদাপ পায়ের আওয়াজ, একজন লোক চিৎকার করতে করতে নেমে এলো, আমার ব্যাগ! আমার ব্যাগ! আমার পার্স কে নিয়েছে?

সমস্ত শরীরটা আমার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এবার কি হবে আমার

আমি জানি। সমস্ত লোক হৈ হৈ করে আমাকে জাপটে ধরবে। পকেটমার হিসেবে আমাকে মারবে, মারতে মারতে আমাকে মেরেই ফেলবে ওরা। আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করলো, না, না আমি চোর নই। আমাকে মেরো না। মেরো না।

কিন্তু প্রমাণ কি? আমি তো ব্যাগটা হাতে নিয়ে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুঁকে ব্যগ্রভাবে দাঁড়িয়ে আছি। আমার কোনো যুক্তি নেই।

লোকটি আমার কাছে নেমে এসেছে, আমি ব্যাগ সমেত হাতটা বাড়িয়ে দিলাম নিঃশব্দে।

লোকটি আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলো। লোকটিকে কোনো প্রশ্ন করার সাহস হলো না আমার, ভেতরের কার্ডগুলোর সঙ্গে তার নাম মেলাতেও পারলাম না। যে নিজে অপরাধী সে তো আর বিচারক হতে পারে না। লোকটির দিকে নিঃশব্দে চেয়ে আমি শাস্তি পাবার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

লোকটি আসলে মারলো না, চ্যাঁচালো না, শুধু আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসলো। তার পরের মুহূর্তেই সে চলন্ত বাস থেকে দারুণ ঝুঁকি নিয়ে ঝুপ করে নেমে গেলো। আমি তাকিয়ে দেখলাম, লোকটি আছাড় খেয়েও পড়েনি, কোনো রকমে ঝোঁক সামলে নিয়েছে, এবং সেই রকমই অদ্ভূত ভাবে তাকিয়ে হাসছে। আমার দিকে চেয়ে।

এর দু'মাস বাদেই আমার টিউশানিটা গেলো। আমার ছাত্রীটি বেশ সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। কিন্তু কেন তার মতিভ্রম হলো কে জানে, একদিন সে আমার হাতের ওপর হাত রেখে বললো, মাস্টারমশাই আপনি আমাকে একটুও ভালোবাসেন না?

আমি দু'পাশে ঘাড় নেড়ে বললুম, না।

ছাত্রীটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, কাঁদতে কাঁদতেই বললো, আপনি কি নিষ্ঠুর!

আমি ঠোঁট টিপে হাসতে লাগলাম।

ছাত্রীটির মা কিংবা বাবা কেউ এ দৃশ্য দেখে ফেলেছিল কিনা জানি

না। তার দুদিন বাদেই তাঁরা অত্যন্ত ভদ্রতা ও লজ্জার সঙ্গে আমাকে জানালেন যে আমার আর আসার দরকার নেই। এর জন্যে আমি কিছু মনে করবো না তো? তাঁরা এক মাসের মাইনে অতিরিক্ত দিয়ে দিতে রাজী আছেন। আমিও অত্যন্ত ভদ্রতা ও লজ্জার সঙ্গে বললাম, না, না, এতে আর মনে করার কি আছে?

এর ছ'মাস বাদেই ডাকে তার বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি পেলাম। ডাকে পাঠানো চিঠিতে নেমন্তন্ন খেতে যেতে নেই—এই অবস্থাতে আমি আর গেলাম না, তাছাড়া উপহার দেবারও একটা প্রশ্ন ছিলো।

আরও ছ'মাস বাদে লাইট হাউস সিনেমার সামনে আমার সেই ছাত্রী ও তার বরের সঙ্গে দেখা। আমি অবশ্য তখন একটা চাকরি পেয়েছি। আমার ছাত্রীটির কপালে নতুন সিঁদুর, মুখখানা জ্বলজ্বলে, হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে আমাকে ডেকে বললো, মাস্টার মশাই, আসুন আলাপ করিয়ে দিই, এই হচ্ছে আমার—

হাত জোড় করে আমি দৃষ্টি স্থির করে রইলাম। চিনতে আমার একটুও দেরি হয়নি। ছাত্রীর স্বামীও নিশ্চয় আমাকে চিনতে পেরেছে, কেন না মুখে সেই রকম অদ্ভুত হাসি। এই সেই লোক—আমার হাত থেকে মানি ব্যাগটা নিয়ে যে চলন্ত বাস থেকে নেমে পড়েছিল।

ছিঃ দীপা, এরকম একটা লোক তোমার মাস্টার মশাই ছিল?—একথা কি ও আমার দিকে তাকিয়ে বলবে? আমার কিন্তু আর ভয় করছে না—আমি ওর দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছি।

ছাত্রীর স্বামী সে সব কিছুই বললো না। বরং চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হলো। আমি এবার বললাম, চিনতে পারছেন? লোকটি বললো, হ্যা, হ্যা, ভালো তো। আচ্ছা আজ চলি, সিনেমা আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে।

যাবার আগে ছাত্রীটি আমার দিকে তাকাতেই আমি রহস্যময় ভাবে হাসলাম।

সেদিনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, আজ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম, এই লোকটির মানিব্যাগ নয়, আমার ওপরে টেক্কা দিয়েছিল, আমি

সৌখিন চোর হতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ও অনেক পাকা—তাই ও আমার চেয়ে সার্থক হয়েছে, অনেক।

ছাত্রীটির প্রতি আমি মনে মনে বললাম, ভয় নেই, তুমি জীবনে সুখী হবে। আমার চেয়ে বুদ্ধিমান লোকের হাতে তুমি পড়েছো। ভাগ্যিস, আমি তোমাকে ভালোবাসিনি, তাইতো তোমার এই সৌভাগ্য।

## কলকাতার গলিপথ

বৃদ্ধের শরীরের হাজার বলিরেখার মতোই পুরোনো শহরের গলিপথ। যে শহরের গলি নেই সে শহর বনেদী নয়। সে শহরের ইতিহাস নেই। গলি নেই নিউ দিল্লীতে, চণ্ডীগড়ে, নেই নতুন প্ল্যান্ড টাউনগুলিতে। সেখানে শুধু এক-প্যাটার্নের, এক মাপের দেশলাইয়ের বাক্সর মতো বাড়ি, আর ঘন ঘন ক্রশ রোড। দেখলে বিরক্ত লাগে, চোখ ক্লান্ত হয়, নতুন গেলে নিজের বাড়ি ভেবে কলিংবেল টিপে বারবার পরের চাকরের ভ্রূকুটি সহ্য করতে হয়।

গলি আছে বটে কাশীতে। সে কি আজকের শহর,—স্বয়ং মহাদেবের তৈরী। সেখানে গলির অপ্রতিহত গতি—অনেক জায়গাতেই পাথরের বাড়িগুলো পর্যন্ত ভেদ করে গেছে। এই গলির জাল কলকাতাতেও কম বিস্তৃত নয়।

একদিন আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে সার্কুলার রোড যেতে সর্টকাট করবার জন্য একটা গলিতে ঢুকে পড়েছিলাম। বেশ পরিচ্ছন্ন চকচকে গলি, হাঁটতে ইচ্ছে হয়। বেশ কিছুদূর যাবার পর কয়েকটা বাঁক ঘুরে হঠাৎ খেয়াল হলো, অনেকক্ষণ ধরেই হেঁটে চলেছি। গলি ক্রমে সরু হয়ে এসেছে, পীচের বদলে এখন ইঁট-মাটির রাস্তা। আরো কয়েকবার ডানদিক বাঁদিক ঘোরবার পর গলিটা সম্পূর্ণ ধাঁধালো হয়ে এলো—এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবো কিনা—এ বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ

উপস্থিত হলো। অনেকক্ষণ ধরেই আমার সামনে একটা সাত-আট বছরের বাচ্চা হেঁটে যাচ্ছিলো। কাঁধে বইপত্তরের ব্যাগ, মাঝে মাঝে আপনমনে ছোট ছোট লাফ দিচ্ছে এবং নিশ্চয়ই মনে মনে কথা বলছে। ও নিশ্চয়ই ইস্কুলে যাবে এবং এত গলির মধ্যে ইস্কুল হয় না এই সান্ত্বনায় আমি ওর পিছন পিছন যাচ্ছিলাম। 'খোকা শোনো,'—আমি একবার ডাকলাম। ছেলেটি গম্ভীরভাবে আমার দিকে ফিরে তাকাল—পরক্ষণেই সে তার সুকুমার মুখখানি সঙ্কুচিত করে সাদা দু পাটি দাঁতের মধ্যে তার ছোট লাল জিভখানি বার করে আমাকে কয়েকবার দেখাল। পরক্ষণেই সে ছুটতে লাগলো। আমি হেসে তাকে ধরবার জন্য দ্রুত পা চালালুম। একটা মোড়ে এসে ছেলেটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি—ডানদিকে একটা অতি ক্ষীণ গলি—সেখান দিয়ে একটি মানুষ অতিকষ্টে গা বাঁচিয়ে যেতে পারে—তাও আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল—যাঁর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ প্রায় সমান—তিনি যেতে গেলে মধ্যপথে আটকে যাবেন। এ হেন গলির ওপারেই চওড়া সার্কুলার রোড—এবং সেখানকায় ফুটপাথে সেই বালকটি কোমরে দু হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখের ফ্রেমে জিহ্বার প্রদর্শনী লাগিয়েছে। গলির মধ্যে কিছুদূর এগিয়েছি হঠাৎ ঝপাং করে একটা বাড়ির দরজা খুলে গেলো এবং একটি প্রায়-প্রৌঢ়া জমকালো শাড়ি পরা মহিলা বেরিয়ে এলেন। দুজনের যাবার রাস্তা নেই—ভদ্রমহিলা সবেমাত্র বেরিয়েছেন—যদি একটু পিছিয়ে বাড়ির দরজায় উঠে দাঁড়াতেন—তবে আমি চলে যেতে পারতুম। কিন্তু মহিলা সোজা এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে যুবতী-সুলভ ভাবে চক্ষু নত করলেন। ফলে বাধ্য হয়েই আমাকে শিভাল্‌রি দেখিয়ে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হলো। তিনি যাবার পর আবার ঢুকতে যাবো—এমন সময় দেখি বালকটি অদৃশ্য এবং একটি বিশালকায় ষণ্ড-পুঙ্গব মাথা গলিয়েছে। আমার জামাটা ঠিক লাল রঙের না হলেও গাঢ় গেরুয়া রঙের। সুতরাং নখী-শৃঙ্গীর থেকে শত হস্ত দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলুম। আবার ফিরে আসতে হলো পুরনো গলিপথ ধরেই। কিছু আগে সেই ভদ্রমহিলা। হঠাৎ তিনি

পিছনে তাকিয়ে আমাকে দেখে এমন ভ্রূভঙ্গী করলেন যে, মনে হলো আমাকে তিনি নির্ঘাৎ কোনো পশ্চাৎধাবনকারী রসিক ছোকরা বলে বিবেচনা করে ফেলেছেন। আমার অবস্থা তখন ন যযৌ ন তস্থৌ।

কলকাতা শহরের যারা আদি বাসিন্দা ছিলেন—তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি, এই জঙ্গলকাটা আর্দ্রভূমি কোনোদিন এত বড় শহর হয়ে উঠবে। তাই বাড়িঘর পথঘাট এলোমেলো অবিন্যস্ত। ইটের পর ইট—তার মধ্যে মানুষ কীট। গলি দিয়ে ঘেরা জীবন। এর মধ্যে অনেকেই কখনো কোথাও যাবে না—গলিতেই থাকবে।

বড় রাস্তায় উজ্জ্বল ইলেকট্রিকের আলো—গলিতে অন্ধকার। অনেক গলিই কানা। গলির পরেও আছে বাই-লেন, ফার্স্ট বাই-লেন, সেকেণ্ড বাই-লেন। উত্তর কলকাতা আর কালীঘাট অঞ্চলেই গলি-পথের লুকোচুরি বেশি। এই সব গলিতে চলতে গেলে অহরহ মাথায় আনাজখোসা বৃষ্টি হয়, কুকুরের লড়াই লাগে, পিঠের ওপর আততায়ীর মুষ্ট্যাঘাতের মতো—ছেলেদের ক্রিকেটের বল লাগে। সরকার এবং কলকাতা কর্পোরেশন প্রায় যেন আইন করে ছেলেদের খেলাধুলো বন্ধ করে দিয়েছে। ছেলেদের খেলবার কোনো জায়গা কলকাতায় নেই, স্কুলগুলোর সঙ্গে মাঠ নেই, পার্কগুলোতেও খেলা নিষেধ। সেখানে শুধু ডিস্‌পেপটিক বৃদ্ধরা বায়ু ভক্ষণ করবে আর এ-বাড়ির ঝি ও-বাড়ির চাকরের সঙ্গে রসালাপ করবে। ছেলেদের জন্য ব্যবস্থা রকে বসা কিংবা গলিতে জটলা করা—নিতান্ত স্থানাভাব হলে সিনেমা-হলের চেয়ারে বসা। ছেলেরাও এ আইন মেনে নিয়েছে।

এখানে বিশুদ্ধ হাওয়া নেই, রৌদ্রেরও ব্যয়কুণ্ঠা। অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি এইসব গলির সামনেই বেশি থামে। তবু এইসব গলির মধ্যেও বিস্ময়ের চমক কম নেই। চিৎপুর-জোড়াসাঁকো অঞ্চলের অনেক গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নোংরা কাদা পেরিয়ে হঠাৎ কোনো এক বিশাল প্রাসাদোপম অপরূপ হর্ম্য চোখে পড়বে। কোনো বিখ্যাত মল্লিক, ঠাকুর, দত্তদের বাড়ি। এরকমই এক গরু ছাগল ঘেরা নোংরা এখানকার এক গলির মধ্যে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং লিখেছিলেন 'মরিতে চাহি

না আমি সুন্দর ভুবনে।'

গলির নামেরও অনেক বাহার আছে, ইতিহাস কিংবদন্তি আছে, সে অনন্ত কাহিনী। ভোলা ময়রা লেন, অ্যাণ্টনি বাগান, ছকু খানসামা লেন, হালসিবাগান, পার্শীবাগান, চোরবাগান,—শুনলেই কৌতূহল হয়। এ ছাড়া আছে বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, রাম ঢ্যাং লেন, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, জ্ঞানাঞ্জন গুঁই লেন প্রভৃতি খটোমটো নাম। নামহীন গলিও আছে। যেমন, চিৎপুর থেকে গঙ্গার পাড়ে যেতে থার্ড লেন, ফোর্থ লেন, ফিফ্‌থ লেন, প্রভৃতি। গলির নাম নিয়ে সেই মজার গল্পটা নিশ্চয়ই অনেকেরই জানা। বাঞ্ছারাম অক্রুর লেনে একটা গরু মরেছে—কর্পোরেশনের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এসেছে রিপোর্ট লিখতে। খাতা খুলে রিপোর্ট লিখতে গিয়ে থতমত খেয়ে গেলেন ভদ্রলোক। বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন? এর বানান কি ইংরেজীতে? সর্বনাশ! ভদ্রলোক শেষে সেই মরা গরুর পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন পাশের হরি সেন লেন-এ। তারপর গড়গড় করে রিপোর্ট লিখলেন, হরি সেন লেন-এ একটা মরা গরু পাওয়া গেছে!

নালা-নর্দমা-খাল গিয়ে পড়ে নদীতে, নদী পড়ে মহানদীতে, মহানদীরা যায় সমুদ্রের দিকে। কলকাতার গলি পড়েছে স্ট্রীট, রোড, রো, এভিনিউতে। আর তারা, কলকাতার বেশির ভাগ প্রধান রাজপথ ছুটে গেছে ময়দানের দিকে। এই ময়দানই কলকাতার প্রধান প্রয়োজনীয় অসংযম। এখানেই কলকাতার সমস্ত গলিপথের বদ্ধ-বাতাসের মুক্তি।

## প্রতিমূর্তি

কণ্ডাক্টর টিকিট চাইতেই ছেলেটি বললো, দিচ্ছি, একটু পরে দিচ্ছি। কণ্ডাক্টর এবার একটু ধমক দিয়ে বললো, কতবার করে চাইতে হবে? আমি কতবার আসবো?

ছেলেটি এবার ম্লান মুখে কণ্ডাক্টরের দিকে তাকালো। বাসটা তখন থেমে আছে। বাইরে সেই সময় একটা আকর্ষণীয় দৃশ্য ছিলো। একটি মেয়ে আর একটি মেয়ের হাত ধরে টানছে। বোধহয় দু'জনের দু'দিকে যাবার কথা, তবু একজন আর একজনকে নিজের পথে নিয়ে যেতে চাইছে। বেশ ঝকঝকে চেহারার মেয়ে দুটি। এই দৃশ্য না দেখে তক্ষুনি টিকিট কাটতে কারুর ইচ্ছে করে না। তবু কণ্ডাক্টর ছেলেটিকে বকুনি দিলো। আমরা সবাই বড্ড অসহিষ্ণু।

ছেলেটি কোনো প্রতিবাদ করলো না। বকুনিটা হজম করে গেলো। ছেলেটি রোগা, গায়ের জামাটা মলিন, সম্ভবত খুব লাজুক, তাই কণ্ডাক্টার ওকে অমন বকুনি দিতে পারলো। ছেলেটির পাশেই আমি বসে আছি, আমার পোশাক বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য। চেহারাতেও একটা গাম্ভীর্য আছে—আমার সঙ্গে ঐ বাস কণ্ডাক্টার মোটেই ওরকম ঝাঁঝালো সুরে কথা বলার সাহস পেতো না। ছেলেটি বুকপকেট থেকে একগাদা কাগজ বার করলো। নানারকম চিঠি, খবরের কাগজের কাটিং, আরও কয়েকটা কাগজে হাতের লেখা কী সব। এই সব কাগজের মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি এক টাকার নোট।

ছেলেটি জামা ও প্যান্টের অন্য পকেটগুলো হাতড়ে দেখলো, আর কোনো পয়সা আছে কিনা। নেই। ঐ একটা টাকাই।

ছেলেটি ঐ টাকাটা এমনভাবে বাড়িয়ে দিলো যেন সে নিজের পরম সম্পদ অনিচ্ছায় তুলে দিচ্ছে অপরের হাতে।

কণ্ডাক্টর টিকিট ও খুচরো ফেরত দিয়ে চলে গেলো।

আমি ছেলেটিকে ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ওর গালে দুদিনের দাড়ি। কোলের ওপর একটি মোটা বই, খবরের কাগজের মলাট দেওয়া। পায়ে চটি, তার ডান পায়েরটায় একটা স্ট্র্যাপ ছেঁড়া।

আমি ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি টের পেয়ে ছেলেটি একটু অস্বস্তি বোধ করলো। সে মুখ ফেরালো রাস্তার দিকে।

আমি কিন্তু ঐ ছেলেটিকে দেখছি না, দেখছি নিজেকে। ছেলেটির বয়েস কত হবে, তেইশ কি চব্বিশ। ঐ বয়েসে আমার চেহারা ঠিক ঐ

রকম ছিলো, ঐ রকম পোশাক, পুরনো চটির স্ট্র্যাপ যখন-তখন ছিঁড়ে যেতো। আমারও পকেটে এক টাকার বেশি কখনো থাকতো না। অনেক সময় তারও কম। আমি বাসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে টিকিট ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতাম। তখন আমি পাস করা বেকার।

ছেলেটি যেন হুবহু আমারই চব্বিশ বছর বয়েসের প্রতিমূর্তি হয়ে আমারই পাশে বসে আছে।

ওর পকেটে ঐ হাতে লেখা ভাঁজ করা কাগজগুলো কী? কবিতা? হতে পারে। এই ছেলেটি নিশ্চয়ই বেকার এবং কবিতা লেখে। খবরের কাগজের কাটিংগুলো নিশ্চয়ই চাকরির বিজ্ঞাপন। আমার পকেটেও ঐ রকম থাকতো। কবিতা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম, লজ্জায় কারুকে পড়ে শোনাতে পারতাম না। আমার কবিতার একমাত্র পাঠিকা ছিলো স্বপ্না। দেখা হলেই বলতো, কী লিখেছো কাল রাত্তিরে? দেখি? স্বপ্না আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিতো। অনেক সময় কবিতার বদলে থাকতো চিঠি। স্বপ্নার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হলেও ওকে চিঠি লিখতাম। অনেক কথাই মুখে বলা যায় না। এক-একদিন দুজনেই দুজনকে চিঠি দিতাম। অবশ্য স্বপ্নার সঙ্গে নিরিবিলিতে দেখা করার সুযোগ ছিলো খুবই কম। এমন কোনো জায়গা ছিলো না···

ছেলেটি একসময় মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কটা বাজে বলতে পারেন? সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে?

আমি বললাম, আমার কাছে তো ঘড়ি নেই ভাই।

ব্যস, ওইটুকুই কথা হলো ওর সঙ্গে। আর কিছু না। ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। যেন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেলে ওর খুব বিপদ ঘটে যাবে।

ঐ চব্বিশ বছর বয়েসে, পয়সা বাঁচাবার জন্য আমি অনেক সময় হেঁটে যাতায়াত করতাম। সারা শহর টো টো করে হেঁটে বেড়িয়েছি। একবার একটা চাকরির ইন্টারভিউতে যাবার সময় বাসের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, পকেটে চল্লিশটা পয়সা, মনে মনে ভাবছিলাম, বাসের

খুচরোটা পয়সা বাঁচাতে পারলে বিকেলে কফি হাউসে এক কাপ কফি অন্তত খেতে পারবো। হঠাৎ দোতলার সিঁড়ি থেকে নেমে আসে কণ্ডাক্টর। আমি তাকে দেখে চলন্ত বাস থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম কণ্ডাক্টর আমার হাত চেপে ধরলো। তারপর কী অপমানই না করলো সবার সামনে। তক্ষুনি বুঝেছিলাম, সে ইণ্টারভিউতেও আমার চাকরি হবে না।…

আমার স্টপ এসে গেছে, এবার আমাকে নামতে হবে। আশ্চর্য, ঐ ছেলেটিও উঠে দাঁড়ালো। ও আর আমি এক জায়গাতেই নামবো। ঠিক যেন এখনকার আমি আর চব্বিশ বছরের আগেকার আমি পাশাপাশি বাস থেকে নামছি। আমি ছেলেটির নাম জানি না। হতে পারে, ওরও নাম সুনীল। সুনীল তো কত লোকেরই নাম হয়।

বাস-স্টপে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটি ব্যস্তভাবে সেই মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলো। ঠিক যেমনভাবে আমি যেতাম স্বপ্নার কাছে।

আমি রাস্তা পেরিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওরা আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। আমি ওদের দেখছি। ঠিক যেন পুলিসের গোয়েন্দা। যদিও আমার খুব জরুরি কাজ আছে, এক্ষুনি যাওয়া দরকার, তবু যেন ওরা চুম্বকের মতন আমাকে আকর্ষণ করছে! ঐ মেয়েটির নাম কি স্বপ্না? হতেও পারে। স্বপ্না তো অনেক মেয়েরই নাম হয়।

ওরা একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বললো। মেয়েটি চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। বোধহয় বাড়ির লোকজনের দেখে ফেলার ভয়। তারপর ওরা কাছেই একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লো।

এই রে, ছেলেটির পকেটে তো মাত্র বারো আনা পয়সা। তার বেশি যে নেই তা তো আমি জানি। এই কটা পয়সায় কী করে চলবে ওদের? শুধু দু'কাপ চা হতে পারে এই বিকেলবেলা আর কিছু খাবে না? তা ছাড়া শুধু দু কাপ নিলে তো বেশিক্ষণ বসতে দেবে না ওদের, একটু বাদেই তাড়া লাগাবে। আমার কাছে টাকা আছে,

ওদের দিয়ে আসবো? না, তা হয় না! ওরা নেবে কেন? ওরা কি বুঝবে যে আমি আদর করতে চাইছি আমার চব্বিশ বছর বয়েসটাকে। না, তা বোঝানো যাবে না, বরং ওরা অপমানিত বোধ করতে পারে।

হয়তো মেয়েটির কাছে টাকা আছে। সে খাওয়াবে। আমার বেলায় এরকম হতো। আমার পকেটে পয়সা থাকতো না, স্বপ্না আমাকে খাইয়েছে মাঝে মাঝে। স্বপ্না তখন একটা মর্নিং স্কুলে কাজ পেয়েছিলো, ওর কাছে মাসের প্রথম দিকে অন্তত টাকা থাকতো। আমি অবশ্য গ্লানি বোধ করতাম খুব। আমি পুরুষ মানুষ, আমারই উচিত আমার বান্ধবীকে খাওয়ানো। হোটেলে রেস্তোরাঁয় মেয়েদের টাকা দেওয়া আমি একদম পছন্দ করি না। কিন্তু তখন তো কোনো উপায় ছিলো না। তখন আমি ছিলাম নিতান্তই বেকার এক সামান্য কবি।

আমি ভেবেছিলাম দিনকাল বদলে যাবে। আমাদের ছোট ভাইদের আর এরকম অপমান ও গ্লানি সহ্য করতে হবে না। কিন্তু কিছুই বদলায়নি।

রাস্তা পেরিয়ে আমি সেই চায়ের দোকানটার সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে গেলাম। এক কোণের দিকের টেবিলে ওরা বসে আছে মুখোমুখি, নীরব। পরস্পরের দিকে স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি। আমার মনে হলো, ঠিক যেন চব্বিশ বছর বয়সের আমিই ওখানে বসে আছি স্বপ্নার সামনে।

## কলকাতা শহরের ভাষা

সুদূর টেক্‌সাসের এ অ্যানড এম কলেজ থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা ইংরেজি অভিধান দৈবাৎ চোখে পড়লো। বইটিতে প্রচুর বাংলা শব্দ বাংলা অক্ষরেই ছাপা, পাশে বাংলা শব্দের উচ্চারণ দেওয়া আছে ইংরেজিতে। বইটিতে কিছু কিছু ভুল আছে, কিছু কিছু উচ্চারণ বিকৃত, কিন্তু সে-সব ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে ইচ্ছে করে না, পৃথিবীর অন্য

প্রান্তে, টেক্‌সাসে বাংলা অক্ষর ছাপা হয়েছে, ভাবতেই শিহরণ লাগে!

কিন্তু পাতা উল্টে গেলে কয়েকটি মজার মজার শব্দ চোখে পড়ে। যেমন মিস্‌টার কথাটির বাংলা দেওয়া আছে, মিঞা। ইয়েস-এর বাংলা 'আইজ্ঞা', ব্যাঙকে লেখা হয়েছে বেঙ। ডিসাইপ্‌ল-এর বাংলা আছে 'মুরিদ', এ শব্দটি তো আগে কোনো বাংলা লেখায় পাইনি। মর্তমান কলা চোখে পড়লো না, কিন্তু 'মদনা' নামে এক রকমের কলার উল্লেখ আছে এই নাতিদীর্ঘ অভিধানে। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো এলো কী করে? এ রহস্য খুব জটিল নয়, যে আমেরিকান ভদ্রলোক অভিধানটি সংকলন করেছেন, তাঁর গবেষণাস্থল টেক্‌সাস হলেও তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য এসেছিলেন ঢাকা শহরে। একটি গ্রীষ্ম সেখানে অতিবাহিত করেছেন। ঢাকা অঞ্চলের কথ্য বাংলার প্রভাব পড়েছে বইটিতে।

বইটির ত্রুটি খুব বেশি নয়। এবং ঢাকা অঞ্চলের বাংলার সঙ্গেও মার্জিত বাংলা সাহিত্যের ভাষার সামান্যই তফাত। উর্দু শব্দ ব্যবহারের যে প্রবণতা প্রথম দিকে দেখা গিয়েছিল, এখন তা কমে গিয়ে মোটামুটি শুদ্ধ বাংলা শব্দই ব্যবহৃত হয় পাকিস্তানের সাহিত্যে। সেদিক থেকে তেমন আপত্তিকর কিছু নেই, কিন্তু একটা কথা ভাবলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় যে, যে বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা করার জন্য কোনো গবেষক শুধু ঢাকা শহরই ঘুরে গেছেন, কলকাতায় আসার প্রয়োজনই মনে করেননি। হয়তো তিনি ভেবেছেন বাংলা পৃথিবীতে পাকিস্তানেরই রাষ্ট্রভাষা, সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানের কেন্দ্র ঢাকাই বাংলা ভাষার কেন্দ্র। তাহলে কলকাতা শহরের ভাষা কী?

কলকাতা শহরের ভাষা কী, এটাই প্রশ্ন। হিন্দী এবং ইংরেজি? বহিরাগত যে-কেউ কলকাতায় এসে হিন্দী এবং ইংরেজি দিয়েই কাজ চালাতে পারেন, বাংলা ভাষার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর একেবারে অবহিত না হলেও চলে। বিদেশীরা যে-শহরে একটু বেশি দিন থাকতে চান বা কিছু অন্তরঙ্গভাবে দেখতে চান, সেখানকার আঞ্চলিক ভাষার কিছু শব্দ তাঁরা শিখে নেন। আমি কলকাতায় এমন অনেক বিদেশী দেখেছি,

যাদের পকেটে ছোট হিন্দী অভিধান।

রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন, নিজের দেশে বসে শুধুমাত্র নিজের মাতৃভাষা শিখে শিক্ষিত হওয়া একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর, এখন আগের চেয়েও বেশি নেতিবাচক। ইংরেজির প্রতি মোহ এখন আগের তুলনায় বেশি। পরস্পরের সঙ্গে ইংরেজিতে বা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলা স্বাধীনতার পর আরও বেড়েছে। সরকারী, আধা-সরকারী ও বাণিজ্যিক সংস্থা-গুলিতে এক জাতের মেরুন-রঙা টাই পরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসারের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, যাদের আড়ষ্ট নীরস মুখে সর্বদাই লেগে আছে হো'য়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন একজন অবাঙালী, কলকাতা রেডিও স্টেশনের পরিচালক বাংলায় কথা বলেন না।

এখন দেখা যাক, যে-কলকাতা বাংলাদেশের গর্ব ও সম্পদ, সেখানে একজন বাঙালীর পক্ষে শুধুমাত্র বাংলা জেনে সমস্ত কাজ করা সম্ভব কিনা। চাকরির দরখাস্ত, ছুটির আবেদন, রেশন কার্ড—দুধের কার্ড ইত্যাদি এখনও অনেককে পাড়াপড়শীকে অনুরোধ করে ইংরেজিতে লেখাতে হয়। মনি-অর্ডার ফরম ভরতি করার জন্য পোস্ট-অফিসে গিয়ে এখনও খরচ করতে হয় অতিরিক্ত দশ পয়সা। এই গেল একদিক। অন্যদিকে কলকাতার যে-সমস্ত সিনেমা-হলে শুধু ইংরেজি ছবি দেখানো হয়, সেখানকার কাউন্টারের সামনে প্রায়ই আমি দেখেছি কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের তিন-চারটি ছেলে পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করছে, এই, তুই গিয়ে টিকিটটা কাট না। সমস্যাটা এখানে পয়সার না, ওদের ধারণা কাউন্টারে গিয়ে ইংরেজিতে না চাইলে টিকিট পাওয়া যাবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাউন্টারে উপবিষ্ট অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কর্মীকে দেখেই হয়তো এ রকম ধারণা হয়। কী এক আশ্চর্য কারণে, পুরুষানুক্রমে যে-সমস্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কলকাতায় আছেন, তাঁদের মুখেও কেউ কোনোদিন বাংলা শব্দ শোনেনি, বড় জোর শোনা যায় ভাঙা হিন্দী। কলকাতায় চীনেম্যানদের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার, তারা

নিজেদের ভারতীয় বলে দাবি করে, এবং যদি ভারতীয় হয়, বাংলা দেশের ভারতীয়রা নিশ্চয়ই বাঙালী, তবু কোনো চীনেম্যানের মুখে এ যাবৎ বাংলা শুনিনি। চৌরঙ্গী অঞ্চলে যত দোকানপাট আছে, পরীক্ষা-মূলকভাবে সবগুলিতে ঘুরে যদি দেখা যায়, ইংরেজি বা হিন্দী একেবারে না বলে শুধু বাংলায় কথা বলে কাজ হয় কিনা—তবে সেটা কম কৌতূহলোদ্দীপক হবে না। আমি দেখেছি। শতকরা পঞ্চাশ জায়গায় কাজ হয়নি।

আমাদের ছেলেবেলায় দেখতুম, কিংবা গল্প-উপন্যাসেও পড়েছি, আগে যে সমস্ত মারোয়াড়ী বা পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী এমন কি কাবুলি-ওয়ালারা পর্যন্ত কলকাতায় ব্যবসা করতে আসতেন, তাঁরা অতি দ্রুত অন্তত কাজ চালানো বাংলা শিখে নিতেন। এখন তাঁরা গ্রাহ্যই করেন না। এখন যে-কোনো মারোয়াড়ীর দোকানে ঢুকে আমি যেন হিন্দীতে কথা বলতে বাধ্য। অথচ ওড়িশায় যে বাঙালী গেছেন চাকরিতে বা ব্যবসা করতে তিনি অবিলম্বে উড়িষ্যা ভাষা শিখে নিচ্ছেন, ডালটনগঞ্জ বা পাটনায় কর্মরত যে বাঙালী তাঁকে অনর্গল হিন্দী বলতে ও লিখতে বাধ্য হতে হয়, নইলে চাকরি থাকবে না। বাংলাদেশেই শুধু এ-রকম শর্ত নেই। এর জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও ত্রুটি আছে। কলকাতায় অনেক ধনী মারোয়াড়ীদের স্কুল খোলা হচ্ছে, সেখানে বাংলা পড়াবার ব্যবস্থা নেই। কেন নেই? এ ব্যবস্থা কল্পনাতীত। এত বড় একটি গৌরবময় শহরের অনেক স্কুলে, এ শহরের গৌরবময় ভাষা শেখানো আবশ্যিক হবে না—এ-রকম লজ্জাজনক ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোনো শহরে নেই। প্রতিটি সচেতন নাগরিকের উচিত অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ জানানো যে কলকাতার সমস্ত স্কুলে, শুধু মারোয়াড়ীদেরই নয়, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, মিসনারি, খালসা, চীনে—প্রত্যেকটি স্থায়ী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা যেন একটি আবশ্যিক বিষয় হয়।

# ছোট পত্রিকা, কিন্তু স্বপ্ন বিরাট

ছোট বড় যে-কোনো শহরে বা বর্ধিষ্ণু গঞ্জে গ্রামে খুব শস্তায় চায়ের দোকানে একটা টেবিল বাঁধা থাকে কিছু নির্দিষ্ট যুবকের জন্য। তারা পাঁচ কাপ চা সাতজন মিলে ভাগাভাগি করে খায়, বহুক্ষণ টেবল জুড়ে থাকে, কিন্তু দোকানের মালিক সাধারণত তাদের প্রতি প্রসন্ন হয় না, বরং খানিকটা মমতা মেশানো প্রশ্রয় থাকে তাদের প্রতি। রোগা চেহারা, মলিন পোশাক, কিন্তু এদের কণ্ঠস্বর অতি প্রবল, সর্বক্ষণ তারা এক তর্কাতর্কিতে মত্ত থাকে, যার বিষয়বস্তু সাহিত্য। টেবিলে অনেক সময় পড়ে থাকে বালি-কাগজে তোলা প্রুফ, সেটা তাদের নিজস্ব পত্রিকার প্রস্তুতি। বস্তুত, ঐ চায়ের দোকানের টেবিলটাই তাদের পত্রিকার অফিস, যেটা দোকানের মালিকও জানে না।

বাঙালী যুবকদের এই রকম ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশের রীতিটি তুলনারহিত। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস থেকেও অনেক ছোট ছোট সাহিত্য পত্রিকা বেরোয়, কিন্তু প্রতিটি ক্ষুদ্র শহর, এমন কি গ্রাম থেকেও পত্রিকা প্রকাশের প্রচেষ্টায় বাঙালী যুবকরাই অদ্বিতীয়। এবং এর গণ্ডি শুধু পশ্চিম বাংলাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বাংলার বাইরেও বিহার, ওড়িশা, আসাম, এমনকি কানপুর, জব্বলপুরের মতন জায়গা থেকেও বাংলায় সাহিত্য পত্রিকা বেরোয়। এই ব্যাপারটি এখনো সমাজতাত্ত্বিকদের নজর এড়িয়ে আছে, কিন্তু এটা বাঙালী চরিত্রের একটি চমকপ্রদ এবং আমার মতে, মধুর দিক।

এই সব সাহিত্য পত্রিকা, যা লিট্‌ল ম্যাগাজিন নামে পরিচিত, এদের আকারের ক্ষুদ্রতাই কিন্তু এদের বৈশিষ্ট্য। লিট্‌ল ম্যাগাজিন বা লিট্‌ল থিয়েটার এগুলি এক ধরনের বিশেষ আন্দোলনের নাম, যার উদ্দেশ্য নতুন কিছু সৃষ্টি করা। সুতরাং লিট্‌ল ম্যাগাজিন শুধু নতুনদের

পত্রিকাই নয়, সাহিত্যের নতুন কোনো ধারার সূত্রপাত করাও এদের দায়িত্ব।

এত বেশি পত্র-পত্রিকার প্রচলন গত কুড়ি বছর আগেও ছিল না। তখন বাংলা ভাষায় সব কটি পত্র-পত্রিকার নাম আমরা এক নিশ্বাসে মুখস্থ বলতে পারতাম। সম্ভবত, রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর বছর, ১৯১১ থেকেই এত বেশি পত্র-পত্রিকার প্রাদুর্ভাব। এখন বাংলায় রেজিস্টার্ড পত্রিকার সংখ্যাই আঠেরো শোর বেশি। আনরেজিস্টার্ড পত্র-পত্রিকা অন্তত এর আরও তিন গুণ তো হবেই। আমার সামনে যে দশটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন এই মুহূর্তে আছে, তার মধ্যে সাতটিতেই কোনো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নেই। শুধু ডিক্লারেশন নিয়ে, কিংবা কিছুই না নিয়ে, সঙ্কলন নাম দিয়েও অনেক পত্রিকা বেরোয়। আদালতে গিয়ে টাকা খরচ করে ডিক্লারেশান নেওয়াও অনেক সময় এই পত্রিকার উদ্যোক্তা-দের পক্ষে গুরুভার হয়ে পড়ে। এবং সেটা খুব স্বাভাবিক। এই সব পত্রিকা প্রকাশের পিছনের ইতিহাস অনুধাবন করলেই সেটা বোঝা যায়।

নিছক সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া এই সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। একটি শহরে অনেক যুবকের মধ্যে আট-দশজন যেন কী ভাবে পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে যায় এবং তারা অন্যদের থেকে অনেক দূরে সরে যায়। প্রায় গুপ্ত সমিতির মতনই তারা স্থাপন করে এক মৈত্রী, যার বন্ধনসূত্র সাহিত্য-প্রেম। তারা নিজেরা কিছু সৃষ্টিও করতে চায়। বড় বড় পত্রিকার পৃষ্ঠায় সহজে ঠাঁই পাবার আশা নেই বলে তারা প্রকাশ করে নিজেদের কাগজ। বত্রিশ বা আটচল্লিশ পৃষ্ঠার, নামে ত্রৈমাসিক হলেও অনিয়মিত। ছাপা হয় আড়াইশো বা পাঁচশো কপি, খরচ হয় প্রতি সংখ্যায় অন্তত তিন-চারশো টাকা। যেসব যুবকদের উদ্যমে এই সব পত্রিকা বেরোয়, তারা অধিকাংশই ছাত্র কিংবা বেকার, দু'একজন বড় ভাগ্যে ছোটখাটো চাকরি পেয়ে গেছে। খুব বড় চাকরি পেয়ে গেলে কেউ আর সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। সুতরাং প্রতি সংখ্যায় এই তিন-চারশো টাকা

যোগাড় করতে গিয়ে এদের যে কতরকম উপায় অবলম্বন করতে হয়, তার আর ইয়ত্তা নেই। বড় কষ্টের, বড় মায়াময় টাকা। কেউ বাড়ির বাজারের পয়সা চুরি করে, কেউ মায়ের লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে, কেউ রেশনের চাল এক কিলো কম এনে, কেউ বা টিউশানি করে এই টাকা সংগ্রহ করে। বিক্রি থেকে কিছুই প্রায় ফেরত আসে না। বিজ্ঞাপনের কোনো ভরসা নেই। বড় বড় বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান এদের পাত্তাই দেয় না, চেনাশুনো দোকান-টোকানের কয়েকটা বিজ্ঞাপন থাকে, তারপর সেই বিজ্ঞাপনের টাকা আদায় করতে তিন জোড়া জুতো ছিঁড়ে যায়। ছোট ছোট পত্র-পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দিয়ে উৎসাহিত করার সরকারী নীতি বেশ কয়েকবার ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু অজস্র নিয়ম-কানুনের বেড়াজাল ডিঙিয়ে ছোট পত্রিকাগুলি সেই পর্যন্ত পৌঁছোতেই পারে না।

এই সব পত্র-পত্রিকা অধিকাংশই ভরা থাকে কবিতায়। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, বাঙালী যুবকরা বুঝি গল্প লিখতে ভুলেই গেছে, শুধু কবিতাতেই তাদের মনোযোগ। কারণটা আসলে অন্য। একটা গল্প অন্তত আট-দশ পাতার কমে লেখা যায় না। বত্রিশ পাতার কাগজে তা হলে তিনটির বেশি গল্প প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু কবিতা ছাপা যায় অন্তত একত্রিশটা, এক পত্রিকায় একত্রিশজন লেখককে একসঙ্গে আনা যায়। অন্তত সাত-আটজন উদ্যোক্তার মধ্যে কেউ বাদ পড়ে না। কবিতা লেখার ঝোঁক এই কারণেই বেড়েছে যে, তা ছাপা সহজ। গল্প ছাপার সম্ভাবনা অনেক সুদূরপরাহত। অবশ্য এর একটা অন্য দিকও আছে, ছাপা সহজ বলেই অনেকের ধারণা হয়ে গেছে, কবিতা লেখাটাও বুঝি খুব সহজ। এর ফল সব সময় খুব সুখকর হয় না।

খুব বেশি দীর্ঘজীবী হয় না এই সব লিটল ম্যাগাজিন। প্রকৃতির নিয়মেই সদ্য তরুণরা একসময় বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, অনেক বেকার সাকার হয়ে যায়, তারপর চাকরির প্রয়োজনে ছিটকে পড়ে নানান জায়গায়। দল ভেঙে যায়। এ-ছাড়া আছে মতভেদ। সম্পাদকের বেশি খবরদারি

অন্তদের সহ্য হয় না, কেউ বেশি টাকা দেয় বলেই বেশি লেখা ছাপার দাবি করে, রাজনৈতিক মতামতেরও অনুপ্রবেশ ঘটে কখনো কখনো, তখন ঝগড়াঝাঁটি হয়, দলটি দু'ভাগ হয়ে দুটি পত্রিকা বেরোয়। কিছুদিন পর দুটি পত্রিকাই উঠে যায়। আবার পরবর্তীকালের সত্য তরুণরা আর একটি নতুন পত্রিকার উদ্যোগ করে সেই একই জায়গা থেকে।

এক-একটা পত্র-পত্রিকাকে ঘিরে এক-একটা ছোটখাটো সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। সারা দেশের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে এরকম গোষ্ঠী অসংখ্য। দূরের নবীন লেখকদের একটা অভিমান আছে কলকাতা সম্পর্কে। তারা মনে করে, কলকাতার বড় বড় পত্র-পত্রিকা মফস্বলের লেখকদের প্রতি একটুও মনোযোগ দেয় না। আবার কলকাতার বিভিন্ন নবীন লেখকগোষ্ঠী মনে করে, বড় পত্রিকা মানেই এসটাবলিশমেণ্টের দুর্গ। তাদের খুব গোপন অভিলাষ থাকে সেই সব এসটাবলিশমেণ্টে ঢুকে পড়ার, কিন্তু প্রকাশ্যে অস্বীকার করে তারাও বার করে নিজস্ব পত্রিকা। কলকাতার কলেজ স্ট্রীট কফি হাউস এই রকম বহু নতুন পত্রিকার অলিখিত কার্যালয়। এই ভাবে প্রবাহিত হতে থাকে সাহিত্যের স্রোত।

এক-একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন বড় জোর চার বা পাঁচ বছর টিঁকে থেকে তার পর নিঃশব্দে মারা যায়। এদের নিয়ে কোনো শোকসভা হয় না। সেই পত্রিকার লেখকরা ছড়িয়ে যায় অন্য পত্র-পত্রিকায়। অনেকে লেখা থামিয়ে দেয়। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের অনেক একনিষ্ঠ কর্মী বা লেখক থাকে—তার মধ্যে মাত্র দুজন বা একজনই হয়তো প্রতিষ্ঠা পায় কিংবা সারাজীবন লিখে যায়। আর যারা প্রতিষ্ঠা পেল না কিংবা মিলিয়ে গেল সংসারের রুক্ষ ঝামেলায়—তাদের প্রয়াসও একেবারে মূল্যহীন বা গৌরবহীন নয়—তারাও যে সাহিত্যকে ভালোবেসেছিল এক সময়, তারাও যে তাদের হৃদয়-অর্ঘ্য একসময় দিয়েছিল বাক্-দেবীকে, তার ইতিহাস রয়ে গেলো এই কৃশকায়, খসখসে কাগজে ছাপা পত্র-পত্রিকায়।

# হঠাৎ দেখা

সকাল ছটা থেকে রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত আমাদের বাড়ির সদরদরজা খোলাই থাকে। আমি থাকি তিনতলায়, দোতলায় বাড়িওয়ালা, একতলায় একজন বৃদ্ধ ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী। দরজা যদি বন্ধ রাখা যায়, তাহলে লোকজন এলে ডাক্তারবাবু বা তাঁর স্ত্রীকেই বরাবর এসে দরজাটা খুলতে হয়। তিনতলায় আমাদের কাছে যখন তখন এবং অনেক লোক আসে, তাদের জন্য বারবার ডাক্তার-গৃহিণীকে দরজা খুলতে বাধ্য করা অনুচিত। তাই দরজা প্রায় সব সময়ই খোলা। ভোরবেলা দুধ আনতে যাবার সময় আমাদের পরিচারিকা দরজা খোলে, আর আমি রাত্তিরবেলা ফিরি বারোটা বা একটায়, কোন দিন তারও পরে, সেটা বন্ধ করি।

এর কিছু ফল ভোগ করতেই হয়। ছাদের সিঁড়িতে একটা র‍্যাকে কিছু পুরনো বই রেখেছিলাম। একদিন দেখি সেগুলো উধাও। আর এক জায়গায় পুরনো খবরের কাগজ গাদা করা ছিল, সেগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেছে। এছাড়া সিঁড়ির বাল্‌ব চুরি তো যখন তখন। এমন কি একটা বালতিতে ময়লা ফেলা হতো, চোররা সেই বালতিটা পর্যন্ত হাতিয়ে নিয়েছে।

ব্রীজের ওপারে, রেললাইনের ধারে বস্তি, সেখানকার ছেলেদের সব সময় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখি। হাত-খরচ যোগাড় করার জন্য তারা পার্ট-টাইম চুরির কাজ নিয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুতেই ওদের হাতে-নাতে ধরা যায় না। সিঁড়ি দিয়ে আমি তো যখন তখন নামি, কোনদিনও ওদের বাল্‌ব চুরি করতে দেখিনি। আজ নতুন বাল্‌ব লাগালে পরের দিনই সেটা হাওয়া। বাল্‌বটা যত উঁচুতেই লাগানো হোক, ওরা ঠিক সেখান থেকে নেবেই। ওরা তো আর মই সঙ্গে করে আনে না, নিশ্চয়ই একজনের কাঁধের উপর আর একজন দাঁড়িয়ে—

সেই সময় ধরা পড়ার সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়ে।

সবচেয়ে বিরক্তিকর হচ্ছে হাইড্রানটের ঢাকনা চুরি। বাড়ির সামনেই, রাস্তার উপর হাইড্রানট, তার লোহার ঢাকনাটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। ঐটুকু পুরনো লোহার কত দাম জানি না। কারা কেনে? যারা কেনে, তারা চোরাই মাল জেনে শুনেই কেনে—কারণ করপোরেশনের ছাপ মারা লোহার ঢাকনা দেখলেই তো চেনা যাবে। গরীব দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি হিসেবে বস্তির ছেলেদের অন্যান্য চুরিগুলি মেনে নিলেও এই লোহার ঢাকনা চুরির ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে পারি না। যে কোন সময় যে কোন লোকের ঐ গর্তে পড়ে হাত পা ভাঙতে পারে। রাত্তিরবেলা অন্ধকারের মধ্যে ফেরার সময় আমি প্রত্যেকদিন খুব সাবধানে হাঁটি।

হাইড্রানটের ঢাকনা চুরি হয় দিনের বেলা। সকালে দেখেছি, দুপুরে নেই! জিনিসটা বেশ ভারী, খুলতেও খানিকটা সময় লাগার কথা—তবু চোখের নিমেষে কি করে সেটা ওরা সরিয়ে নিয়ে যায় জানি না। অনেকদিন আমি আড়ালে, তক্কে তক্কে থেকেছি। একদিনও ধরতে পরিনি। কোনোদিন যদি দেখতে পাই, এমন মার মারবো! হাত নিশপিশ করে।

ডাক্তারবাবুর গাড়ির হেড লাইটও দিনের বেলাই খুলে নিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু গাড়ির সামনে কোমরে হাত দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। মানুষটি অতি ভদ্র ও শান্ত, তবু চাপা রাগ তাঁর মুখে স্পষ্ট। এই ধরনের ছিঁচকে চুরিতে ক্ষতির চেয়ে বিরক্তিটাই বেশী। হাতেনাতে চোর ধরতে না পারলে পুলিসে খবর দিয়েও কোনো লাভ নেই।

একদিন ভোরবেলা ছাদে পায়চারি করতে গিয়ে দেখি, সেখানে দুটি খালি বীয়ারের বোতল গড়াচ্ছে। চমকে উঠি। এ ধরনের অপকর্ম তো এ বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ করে না। কিন্তু আমিও তো বেশ কিছুদিনের মধ্যে ছাদে বসে বীয়ার পান করিনি। তাহলে এই বোতল দুটো? বেশ টাটকা বোতল, মুখে তখনও ফেনা জমে।

একটু শিউরে উঠতে হলো। চোরেরা যে ছাদে এসে শুধু বসেই

থাকে, তাই না, তারা বীয়ার পান করে ; ব্যাপারটা কিছুতেই বিশ্বাস-যোগ্য মনে হয় না, অথচ বোতল দুটো টাটকা সাক্ষী। অন্য কোনো ছাদ থেকে তো বোতল দুটো ছুঁড়ে দেয়নি, তা হলে কিছুতেই এমন আস্ত থাকতো না। ছাদটা এমনই যে অন্য কোনো ছাদ থেকে কারুর লাফিয়ে আসার উপায় নেই। তাহলে, সদরদরজা দিয়ে ঢুকে, তিনতলা পর্যন্ত সিঁড়ি ভেঙে, চোরেরা ছাদে এসেছে এবং বসে বসে বীয়ার পান করেছে ? এতখানি সাহস ? হাইড্রানটের ঢাকনা চুরি করা টাকায় এই বীয়ার ! রাগে গা জ্বলে যায়।

আমি তিনতলায় থাকি, সুতরাং ছাদটা আমারই ব্যবহার্য। সেদিন থেকে ছাদের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিলাম।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে যখন যাই, বস্তির ছেলেদের মুখের ওপর চোখ বুলোই। এদের মধ্যে কে বাল্‌ব চোর ? কে হাইড্রানটের ঢাকনা স্পেশালিস্ট ? ছাদের ওপর গিয়ে বীয়ার পান কার কার কীর্তি ? মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায়টি নেই।

কোনো এক সন্ধ্যেবেলা, নিশ্চয়ই রবিবারই হবে। না হলে আমি বাড়ি ছিলাম কেন, নীচতলায় চ্যাঁচামেচির আওয়াজ শুনলাম। ডাক্তারবাবুরই গলা। অমন শান্ত নির্বিরোধী মানুষটি হঠাৎ এরকম উত্তেজিত হবেন কেন ! তরতর করে আমিও নীচে নেমে এলাম।

দৃশ্যটি নিজের চোখে না দেখলে আমিও অবিশ্বাস্য বলতাম। সদর-দরজা দিয়ে ঢুকেই, সিঁড়ির তলায় যে খানিকটা অন্ধকার মতন ফাঁকা জায়গা, যেখানে দিনের বেলা কখনো একটা রাস্তার কুকুরকে শুয়ে থাকতে দেখেছি, সেখানে এক জোড়া নারী পুরুষ। পুরুটি অর্ধ-উলঙ্গ, অর্থাৎ তার গায়ে জামা আছে কিন্তু প্যাণ্ট খোলা। নারীটির বেশবাসও বিস্রস্ত। ইংরেজিতে যাকে বলে মেকিং লাভ, ওরা ওখানে সেটাই করছিল। ছেলেটির বয়েস চব্বিশ পঁচিশ, মেয়েটির আঠারো উনিশ। মুখচেনা, পাড়ার রাস্তায় দেখেছি।

ডাক্তারবাবু ছেলেটির চুলের মুঠি ধরে গর্জন করে বলছেন, তোমাকে আমি থানায় দেবো ! রাস্কেল ! কোন সাহসে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছো ?

ছেলেটি তেড়িয়া গলায় বললো, ছেড়ে দিন। চুলে হাত দেবেন না!

এ ঔদ্ধত্য সহ্য করা যায় না। ডাক্তারবাবু ওকে একটা চড় কষালেন।

হাইড্রানটের ঢাকনা চুরির কারণে যতখানি রাগ ও বিরক্তি আমার মধ্যে জমা ছিল, তা সেই মুহূর্তে ফেটে পড়লো। আমিও ছুটে গিয়ে ছেলেটির গালে খুব জোরে এক চড় কষালাম।

দাঁত কিড়মিড় করে বললাম, হারামজাদা... আবার মুখে মুখে কথা!

ডাক্তারবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, কতটা বাড় বেড়েছে, দেখেছো!

মেয়েটি আলুথালু শাড়ি নিয়ে এক পাশে আড়ষ্ট। ডাক্তারবাবু তাকে হুকুম করলেন, তুমি চলে যাও। এক্ষুনি চলে যাও!

মেয়েটি যেতে চায় না। সে ঐ ছেলেটিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে যাবে না।

আমি হয়তো ছেলেটিকে আরও মারতাম। কিন্তু ঐ একটি চড়েই আমার অন্যরকম একটা অনুভূতি হলো। বহুদিন কারুর গায়ে হাত তুলিনি। পুরুষ মানুষের গায়ের স্পর্শ আমার একদম পছন্দ হয় না। ছেলেটিকে মারার পর আমার হাতটা বিচ্ছিরি লাগছে!

এদিকে চ্যাঁচামেচি শুনে ভিড় জমে যাচ্ছে ক্রমশ। এ রকম একটা দৃশ্য যাতে বাচ্চা ছেলেরাও দেখে না ফেলে তাই আমি ডাক্তারবাবুকে মৃদু গলায় বললাম, ছেড়ে দিন!

ডাক্তারবাবুরও থানা-পুলিসের ঝঞ্ঝাট করার খুব একটা ইচ্ছে নেই। তাই ছেলেটিকে দরজার দিকে ঠেলতে ঠেলতে বললেন, দূর হয়ে যাও! এবার ছেড়ে দিলাম, ফের যদি কখনো এদিকে দেখি···

কিন্তু ছেলেটির প্যাণ্টটা পড়ে আছে সিঁড়ির নীচে। প্যাণ্ট না নিয়ে ছেলেটি যাবে কি করে? একবার ভাবলাম, আমিই প্যাণ্টটা ওকে ছুঁড়ে দিই। কিন্তু প্যাণ্টটা হাত দিয়ে ছুঁতে আমার একটু ঘেন্না ঘেন্না লাগলো। পা দিয়ে ঠেলে দেবো? কিন্তু অপরের পোশাকে আমি

পা ছোঁয়াবোই বা কেন।

আমি বললাম, ডাক্তারবাবু, ওকে প্যাণ্টটা···

ছেলেটি এবার লজ্জায় শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে বললো, আর কখনো···মাপ চাইছি···

প্যাণ্টটা তুলে নিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে গেলো। মেয়েটি গেলো আস্তে আস্তে—একবার পেছন ফিরে তাকালো আমার দিকে—অদ্ভুত হিম দৃষ্টি। বহুদিনের জমানো অভিমান ও তুঃখে ওরকম দৃষ্টি হয়।

উপরে উঠে আসার পর একটু একটু অনুতাপ হতে শুরু করলো, আমি কেন মারলাম? ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিলেই তো হতো। ব্যাধের হাতে ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটিকে নিহত হতে দেখে বাল্মীকি বলেছিলেন, মা নিষাদ—। এখানে আমার ভূমিকা তো ঐ ব্যাধের। মেয়েটির ঐ দৃষ্টি কিছুতেই আমি ভুলতে পারছি না।

হাইড্রোনটার ঢাকনা কিংবা বাল্ব চুরি করতে গিয়ে ওরা একদিনও ধরা পড়েনি। কিন্তু এই ব্যাপারে ধরা পড়ে গেলো, তার মনে ব্যাকুলতাটা কতখানি তীব্র! ব্যাকুলতা না প্রয়োজন, কোন্‌টা ঠিক শব্দ?

ওরাই চুরি করে কিনা আমি জানি না। তবে ওদেরও অভাব কম নয়। কতখানি বেপরোয়া হলে, সামান্য একটু জায়গার অভাবে, অপরের বাড়িতে ঢুকে, সিঁড়ির নীচে মানুষ এই অবস্থায় ধরা পড়ে! কলকাতা শহরে ওদের নিভৃত হবার কোনো উপায় নেই বলেই তো! শুধু ওদের কেন, কলকাতা শহরের হাজার হাজার প্রেমিক প্রেমিকারই তো এই অবস্থা!

যদি চোর হয়ও, তবুও তো ওদেরও মানুষের শরীর। এটাকে কি শুধু লাম্পট্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়? প্রেম জিনিসটা কি শুধু ভদ্দরলোকদের সম্পত্তি?

মনে মনে আমি ছেলেটি ও মেয়েটির কাছে ক্ষমা চাইলাম।

# বিবাহ মানে কি কন্যা সম্প্রদান ?

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'তিথি ডোর' উপন্যাসে বাঙালী হিন্দু বিয়ের অনুষ্ঠানের এক সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। উপন্যাসটির কাহিনী প্রবাহের জন্য ঐ বর্ণনার তেমন প্রয়োজন ছিল না। শুনেছি, সমালোচনার উত্তরে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, এত সব আচার-অনুষ্ঠান তো আর বেশি দিন থাকবে না, লোকে এসব ভুলেই যাবে, তাই আমি লিপিবদ্ধ করে রেখে গেলাম।

'তিথি ডোর' উপন্যাসটির বয়েস প্রায় অর্ধেক শতাব্দী হয়ে গেল। এই সুদীর্ঘ সময়েও হিন্দু বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষ বদল হয়েছে কি? গায়ে-হলুদ, স্ত্রী-আচার, নাপিতদের ভূমিকা, সম্প্রদান, যজ্ঞ, পিঁড়িতে চাপিয়ে কনেকে সাত পাক ঘোরনো, শুভদৃষ্টি এই সব কিছুই তো এখনো আছে। কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত হয়েছে বটে, বাদ যায়নি কিছুই। যদিও সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, আধুনিক সুস্থ মানসিকতা অনুযায়ী দু' একটি প্রথা বাদ দেওয়া স্বাভাবিক ছিল। এই সব আচার অনুষ্ঠানে কিছু কিছু বেশ মনোহর ব্যাপার থাকে, আরও কিছু কিছু একালের রুচিতে বর্জনীয়। যেমন গায়ে হলুদ, শুভদৃষ্টি, বাসর-জাগা, ফুলশয্যা এসব বেশ সুন্দর কিন্তু কন্যা-সম্প্রদান অনুষ্ঠানটি মধ্যযুগীয়, একালের পক্ষে অন্যায়। অন্যান্য সব ধর্মেই বিবাহ মানে দু'জন নারী-পুরুষের সামাজিক মিলনের প্রকাশ্য স্বীকৃতি, দু'জনের ভূমিকাই সমান। কিন্তু হিন্দু বিবাহে মেয়ের বাবা পাত্রের হাতে তাঁর সালঙ্কারা কন্যাকে তুলে দেন, যেন পাত্রিটি একটি জড় পদার্থ, একটা বস্তু!

আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে এই সম্প্রদান অংশটি এখন পুরোপুরি বাদ দেওয়াই সঙ্গত। এ বিষয়ে মেয়েদেরই প্রতিবাদ করা উচিত।

গত দু-এক দশকে বিয়েবাড়িতে একটি ব্যাপারে বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। সেটি বসে খাওয়াদাওয়া দৃশ্যটি। খাওয়ানোদাওয়ানোর খরচ অনেক বেড়েছে, কমে গেছে আন্তরিকতা। আগে প্রত্যেক বাড়িতে

ভিয়েন বসতো, ভাড়া করা ঠাকুরেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঁড়ি-কড়াই-গামলা এনে রান্না বান্না করতো আর পরিবেশনের দায়িত্ব নিত কিছু জোয়ান গোছের আত্মীয়স্বজন, আর পাড়ার অমুকদা, তমুকদা। এরা স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে, কোমরে গামছা বেঁধে কী খাটাখাটনিই না করতো, আর দু-একজন ফোঁপড়দালালি করতো ফুলবাবু সেজে। সব সময় শোনা যেত একটা হৈ হৈ শব্দ, এ পাতে দুখানা লুচি, ওরে মাছ দে, মাছ দে, এই যে ভাই পাশের পাতে একটু মাংস···এক-একজনকে জোর করে রসগোল্লা খাওয়ানো বা মাছ খাওয়ানো দেখে মজা পেত অন্যরা। এই পরিবেশকরা সুসজ্জিত মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার একটা অতিরিক্ত অধিকার পেত, এই ট্রাইবটি এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন শহরের বিয়েবাড়ির ভোজসভায় সবাই নিস্তব্ধ, কেটারিং সার্ভিসের লোকজনেরা যান্ত্রিকভাবে পরিবেশন করে যায়, তাদের কাজের কোন ত্রুটি নেই, হাত ধোবার গরম জল এবং সাবান পর্যন্ত তারা সামনে রেখে যায়।

খাদ্যতালিকারও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আগে কুমড়োর ছক্কা ও লম্বাটে বেগুন ভাজা দিয়ে শুরু হতো, এখন সে সব উঠে গেছে। সাদা ভাত অতিশয় দুর্লভ। আমাদের ছেলেবেলাতে মুর্গীর মাংস বাড়ির বাইরে লুকিয়ে খেতে হতো, কোনো শুভ কাজে মুর্গীর মাংস ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। আগে খানিকটা নিষিদ্ধ ছিল বলে মুর্গীর স্বাদও অনেক ভালো লাগতো, এখন ভাত-ভাত লাগে। কোলেস্টেরল ভীতির জন্য এখন অনেকেই খাসীর মাংস খেতে ভয় পায়। সর্বত্র মুর্গীই চলছে। আগে দই ও রসগোল্লা ছিল আবশ্যিক, খরচ বাঁচাবার জন্য কেউ কেউ রসগোল্লার বদলে দিত লেডিকিনি, এখন দই-রসগোল্লার বদলে অনেক বাড়িতে দেওয়া হয় আইসক্রিম।

এক সময় 'লাভ ম্যারেজ' কথাটা খুব চালু ছিল, এবং সেটা একটা চাপা কৌতুকের বিষয় ছিল। ব্রাহ্মণরে সঙ্গে কায়স্থের বিয়ে বলেই ধরে নেওয়া হতো সেটা প্রেমজ বিবাহ, যেন ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণের, কায়স্থের সঙ্গে কায়স্থের প্রেম হতেই পারে না। ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যেও যে, কত বিচিত্র জাতিভেদ, তা বোঝা যেত পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনগুলি

দেখে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, শ্রেত্রির, ভঙ্গ-কুলীন ইত্যাদি ভাগ ছিল। অনেক বিজ্ঞাপন ছিল ধাঁধার মতন। যেমন, পাত্র সঃ চাঃ, দঃ রাঃ দেখে অনেকবার মানেই বুঝতে পারিনি। পরে জানা গেল, সেই পাত্রটি সরকারী চাকুরে, দক্ষিণ রাঢ়ী। যেন সরকারী চাকুরেরাও আলাদা একটি জাতি।

এই সব বিজ্ঞাপন থেকে অনেক হাসির খোরাক সংগ্রহ করেছিলেন তারাপদ রায়। একটি বিজ্ঞাপন ছিল এই রকম, 'গরিব বি. এ. ফেল ব্রাহ্মণ ছাত্র, কোনো ভদ্র পরিবারে বিবাহ করিয়া ভাইয়ের মতন থাকিতে চাই।' এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী গরিব ছাত্রটি যে কার ভাইয়ের মতন হতে চায়, সেটা পরিষ্কার করেনি।

আর একবার দেখেছিলাম 'পাত্রের আয় মাহিনা ও উপরি মিলাইয়া 'দুই হাজার'। এখানে উপরি কথাটা ওভারটাইম-এর বাংলা কি না তা অবশ্য জানি না।

আমরা ছাত্র বয়সে ভাবতাম, এই পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন ক্রমশ উঠেই যাবে, খবরের কাগজের এই পাতাগুলো পরিচ্ছন্ন হবে। পরের প্রজন্মের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা মোটেই বাবা-মায়ের কথা শুনে বিয়ে করতে চাইবে না। হায় হরি, পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন যে ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এখন বিলেত-আমেরিকা থেকেও ছেলেমেয়েরা দেশে ফিরে ঐ রকম বিজ্ঞাপন দিয়ে বিয়ে সেরে নেয়। এখন অনেকেরই বিয়ে হয়, তারা বিয়ে করে না।

পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন আমি এখনো সময় পেলে পড়ি। মজার খোরাক এখনো পাওয়া যায় যথেষ্ট। তবে পরিবর্তন হয়েছে একটু, মাঝে মাঝে চোখে পড়ে 'অসবর্ণে আপত্তি নেই। একদিন গুণে দেখেছি, একশোটির মধ্যে সাতটা। 'বিধবাতে আপত্তি নাই' এখনও দেখিনি।

এখন পুরোপুরি বিবাহের সিজন, প্রায়ই নেমন্তন্নর চিঠি পাই। কার্ড ছাপার খুব উন্নতি হয়েছে, ভাষাও বদলেছে অনেক। বাঙালরা এখন আর বিক্রমপুর কিংবা মৈমনসিং-এর আদি নিবাসের উল্লেখ করে না। এক-একটি নিমন্ত্রনপত্র এতই সুন্দর ও দামি যে জমিয়ে রাখতে ইচ্ছে হয়।

জয়শ্রী আমাদের কলেজের বান্ধবী ছিল, একদিন সে এলো তার মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। তার স্বামী অনিমেষ থাকে ম্যানিলায়, এখনো এসে পৌঁছয়নি। জয়শ্রীর মেয়ে লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট আগেই শুনেছি, এম এস সি-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে সে এখন পি এইচ ডি করছে। তার বিয়ে হবে, খুব আনন্দের কথা, সে কোনো সহপাঠীকে বিয়ে করছে নাকি, এ কথা জিজ্ঞেস করতেই জয়শ্রী প্রায় ফোঁস করে উঠলো। অন্তত একুশটি পাত্র দেখা হয়েছে, প্রবাসী আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত জয়শ্রীই পছন্দ করেছে এই পাত্রটিকে, যে একেবারে হীরের টুকরো ছেলে।

জয়শ্রীর নিজের যখন বিয়ে হয়েছিল, সেই বয়সটার কথা স্পষ্ট মনে আছে। মনে হয় যেন বেশি দিনের কথা নয়। জয়শ্রী যখন অনিমেষকে বিয়ে করতে চায়, তখন ওর বাবা-মায়ের প্রবল আপত্তি ছিল, কারণ ওদের জাতের মিল ছিল না, তাছাড়া অনিমেষ চাকরি করে না, ছবি আঁকে। জয়শ্রী বাড়ি থেকে চলে এসে লুকিয়ে বিয়ে করে অনিমেষকে, ওর বাবা-মা পুলিসের সাহায্য নিয়ে খোঁজাখুঁজি করেছিল, আমরা বন্ধুরা ওদের দুজনকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। দারুণ উত্তেজনাময় কয়েকটি দিন কেটেছিল, জয়শ্রী তখন সাংঘাতিক মনের জোর দেখিয়েছিল। অনিমেষ এখন বিখ্যাত শিল্পী, ওদের বিবাহ সার্থক।

তবু সেই জয়শ্রী নিজের মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে নিজে পাত্র খুঁজে। আমরা কি ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি?

## প্রতিমার বদলে সেবার ঘটপুজো

আমার ছেলেবেলায় আমি প্রত্যেক বছর পুজোর সময় পূর্ববঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলে যেতাম। খুব রোমাঞ্চকর ছিল সেই যাত্রা। শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনে করে খুলনা। তখন মনে হত, কত দূরের সেই পথ। সারারাত ধরে ট্রেন যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। আসলে কিন্তু

একশো মাইলের চেয়েও কম দূর। এখন তিন-চার ঘণ্টাতেই চলে যাওয়া যায়।

খুলনা থেকে ভোরবেলা স্টিমার। আমরা অবশ্য ছেলেবেলায় তাকেই বলতাম জাহাজ। উপরে, নীচে কত মানুষ। অনেকেই সঙ্গে বিছানা নিয়ে যেত, ডেকে সেই বিছানা পেতে শুয়ে থাকত। স্টিমারে উঠেই জায়গা দখলের জন্য হুটোপাটি শুরু হয়ে যেত একটা। রেলিংয়ের ধারে জায়গা পাওয়ায় জন্য আমাদের খুব উৎসাহ ছিল।

তারপর বিশাল নদীর বুকের ওপর দিয়ে ঝিকমিক করতে করতে এগিয়ে যেত স্টিমার। সেই নদীর জলে আমরা অনেক শুশুক দেখেছি। নদীর চড়ায় শুয়ে শুয়ে রোদ পোহাত কুমিরের দল। সেই কুমিরের গা থেকে ময়লা খুঁটে খুঁটে খেত শালিক পাখি। স্টিমার খুব কাছে চলে এলে সেই কুমিরেরা সড়াত সড়াত করে নেমে পড়ত জলে। এখন মনে হবে, এসব সিনেমার দৃশ্যের মতন। কিন্তু আমরা এ-দৃশ্য সত্যিই দেখেছি, আফ্রিকায় নয়, পূর্ব বাংলার নদীপথে।

গ্রামের বাড়িতে কলকাতা, ভাগলপুর, দিল্লি থেকে আত্মীয়-স্বজনরা সবাই এসে জড়ো হত প্রত্যেক পুজোর সময়। আমার মামাবাড়ির সামনে একটা বিরাট আটচালা ছিল। সেটা অনেকটা কলকাতার বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপের মতো দেখতে, কিন্তু সেটা বাঁধা থাকত সারা বছরই। সেই আটচালার একধারে, পুজোর এক মাস আগে থেকে তৈরি হত ঠাকুর। জলধর নামে একজন কুমোর এসে প্রতিমার মূর্তি বানাত। প্রথমে শুধু খড়ের হাত-পা, আর ধড়। কারও মুখ থাকত না। সেগুলো কেমন যেন অদ্ভুত দেখাত। তারপর তার ওপরে মাটি লাগানো হত কয়েকবার। তাকে বলা হত এক মেটে, দু' মেটে করা।

প্রতিমার মুখ বানাবার সময়টাই ছিল আসল আকর্ষণের। জলধরের দাদা হলধর আরও বড় শিল্পী। সে শুধু আসত মুখ বানাবার জন্য। হলধর লোকটি ছিল ভারী অদ্ভুত। খুব গম্ভীর, কারও সঙ্গে একটাও কথা বলত না। এমন কি, আমার রাশভারী দাদু, তাঁকেও বিশেষ পাত্তা দিত না সে। সে আসত আলাদা একটা নৌকোয়। ঘাটে সেই নৌকোটা

বাঁধা থাকত। সেই নৌকোয় আর কারও প্রবেশের অধিকার ছিল না। আমরা দূর থেকে দেখতাম, সেই নৌকোর মধ্যে অনেক নারকোলের মালার মধ্যে নানারকমের রং গোলা, আর বহু রকমের তুলি।

প্রতিমার মুখ বানাবার আগে হলধর কাউকে দেখতেও দিত না। কয়েকটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হত সামনের দিকটা। তার ভেতরে হলধর শুধু একা থাকত। দু'দিন, তিনদিন কেটে যেত এইভাবে। এর মধ্যে শুধু কয়েক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খেত না সে। আমরা অধীর উৎকণ্ঠায় বাইরে ঘোরাঘুরি করতাম, কেউ কাপড়ের পরদা একটু সরিয়ে উঁকি মারার চেষ্টা করলেই বাড়ির গুরুজনরা খুব ধমক দিতেন।

হঠাৎ এক সময় হলধর নিজেই কাপড়গুলো সব সরিয়ে দিত। তখন ভেসে উঠত যেন এক ম্যাজিকের দৃশ্য। মা দুর্গা তো বটেই, কার্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী, এঁদেরও সকলেরই মুখ তৈরি হয়ে গেছে। শুধু অসুর আর মোষের মুণ্ডু হলধর নিজে বানাত না। আমরা যতজন থাকতাম, প্রত্যেকেরই মনে হত মা-দুর্গা ঠিক তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। বাড়ির সবাই বলত, হলধরের হাতের কী অপূর্ব গুণ, প্রত্যেক-বার প্রতিমার মুখ নতুন রকমের মনে হয়।

মূর্তির মুখ গড়া শেষ হলেই প্রচণ্ড খিদে পেত হলধরের। এক থালা ভর্তি লুচি সাজিয়ে দেওয়া হত তার সামনে। দু-তিন দিনের খিদে সে মিটিয়ে নিত একসঙ্গে। বোধ হয় চল্লিশ-পঞ্চাশখানা লুচি সে খেত। আর তখন সে হেসে হেসে গল্পও করত অনেকের সঙ্গে। এ যেন এক এক অন্য হলধর।

আমাদের বাড়ির কাছেই নদীর ধারে ফুটত প্রচুর কাশ ফুল। আর শিউলি ফুলের গাছ তো অনেক। এই শিউলি আর কাশ ফুল না দেখলে শরৎকালকে যেন চেনাই যায় না। আকাশের মেঘও তখন সাদা হয়ে আসত।

সেই ছেলেবেলায় পুজোর আগের কয়েকটা দিন আমরা একটা খুব নিষ্ঠুর কাজও করতাম। তখন অবশ্য সে বোধ ছিল না। আমাদের মামাবাড়িতে পুজোর তিনদিন মোট চারটে পাঁঠা বলি হত। একদম

কালো রঙের নিখুঁত পাঁঠা বলি দেওয়াই নিয়ম। সেইজন্য আগে থেকেই এরকম চারটে পাঁঠা কিনে রাখা হত বাড়িতে। আমাদের মতন ছোটদের ওপর ভার থাকত সেই পাঁঠাগুলোকে খাওয়ানোদাওয়ানো আর মাঠে ঘুরিয়ে আনার। আমরা তাদের কচি কচি ধান খাওয়াতাম, অনেক আদর করতাম। ক'দিন বাদেই যে তাদের বলি দেওয়া হবে সেটা যেন মনেই থাকত না।

তারপর পুজোর দিনে যখন আমাদের সেই পোষা একটি পাঁঠাকে চড়ানো হত হাড়িকাঠে, সেই পাঁঠাটা দারুণ করুণভাবে ব্যা-ব্যা করে ডাকত, তখনই কেঁপে উঠত আমার বুক। আমি কান্না সামলাতে পারতাম না। ছুটে যেতাম অনেক দূরে।

একবার পুজোর সময় একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশের হাতে বন্দী ছিলেন কলকাতায়। হঠাৎ কী করে শত শত সাহেব-পুলিসের চোখ এড়িয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন দেশের বাইরে। তারপর অনেকদিন তাঁর সঠিক কোনও খবর নেই। কিংবা উলটোপালটা খবর শোনা যেত তাঁর সম্পর্কে। এক বছর পুজোর সময় শোনা গেল, সুভাষ বসু বিশাল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছেন ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করতে।

সেবারে হলধর আর জলধর দুই ভাই মিলে এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল: প্রতিমা বানাবার সময় গোড়া থেকেই পরদা টাঙিয়ে রাখল তারা। আগে থেকে কাউকেই কিছু দেখতে দেবে না। তারপর একসময় যখন সব শেষ হল, তখন প্রতিমা দেখে বাড়ির সবাই এমনই অবাক হয়ে গেল যে, দু-এক মিনিট কোনও কথাই বলতে পারেনি। মা দুর্গার শাড়ির রং জাতীয় কংগ্রেসের পতাকার মতন তিন রঙের। অর্থাৎ তিনি যেন ভারতমাতা। আর অসুরকে দেখতে হুবহু এক সাহেব মিলিটারির মতন। কার্তিক একেবারে সুভাষ বসু। সেই কার্তিকের হাতে তলোয়ার আর ভারতমাতারূপী মা-দুর্গা বর্শা বিঁধিয়ে দিয়েছেন মিলিটারি অসুরের বুকে।

আমরা সবাই সেই মূর্তি দেখে হাততালি দিয়ে উঠলাম। গ্রামের

লোক দল বেঁধে এসে ধন্য ধন্য করতে লাগল। আশপাশের অনেক গ্রাম থেকে লোক ছুটে এল সেই ঠাকুর দেখতে।

কিন্তু অষ্টমী পুজোর দিন এসে গেল পুলিস। ব্রিটিশ সোলজারের বুকে মা দুর্গা বর্শা বেঁধাচ্ছেন, আর কার্তিকের বদলে সুভাষ বসু—এই মূর্তি পুজো করা চলবে না। এটা নাকি দেশদ্রোহিতা। সেই ঠাকুর পুলিসের আদেশে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল আবার। হলধর, জলধরের নাম বলা হল না। আমার দু'জন মামাকে বন্দী করে নিয়ে গেল পুলিস।

পুজো অবশ্য বন্ধ হয়নি। সেবারে প্রতিমার বদলে শুধু ঘট পুজো করেই বাকি কাজ সারা হয়েছিল। বলি অবশ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

## সাহিত্যের হালচাল

হাটে-বাজারে, গঙ্গার ধারে, কফিখানায়, ক্রিকেট খেলার মাঠে, এমন কি সিনেমা-থিয়েটার হলেও এক-একজন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, আমাকে দেখলেই কাছে এগিয়ে আসেন, কথা বলার আগে কপাল কুঁচকে যায় খানিকটা, তারপর বলেন, কলকাতা শহরটার দিন দিন কী অবস্থা হচ্ছে দেখছেন না? আপনারা এই বিষয়ে কিছু লিখুন।

চরিত্র প্রায় এক, বক্তব্য নানা ধরনের। কেউ বলেন, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া তো সব গোল্লায় গেল। কলকাতা-যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কী কাণ্ড হচ্ছে, এ সম্পর্কে আপনারা কিছু লিখতে পারেন না? কিংবা মাছের দাম কী রকম বাড়ছে টের পাচ্ছেন না? কিছু লিখুন আপনারা। কিংবা, সিগারেট খাওয়া কত ক্ষতিকর, এ সম্পর্কে আপনারা কিছু লিখতে পারেন না? কিংবা, সব বাঙালি মেয়েরা আজকাল চুল ছেঁটে মেমসাহেব হয়ে যাচ্ছে, এসব আপনাদের চোখে পড়ে না? এই বিষয়ে কিছু লিখুন। কিছু লিখুন। কিছু লিখুন···

আমার ধারণা, সব সাহিত্যজীবীকেই এই রকম উপরোধ শুনতে হয় অনবরত।

লেখকদের দেখলেই অনেক মানুষের মনে দেশ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা জাগে। কিংবা সমাজ সম্পর্কে কিংবা সাম্প্রতিক কোনও সমস্যা…। তাঁরা সেই সব সমস্যা সমাধানের ভার লেখকদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান।

এই সব ক্ষেত্রে, এড়িয়ে যাবার জন্য আমি প্রকাশ্যে বলি, হ্যাঁ, লিখবো, লিখবো, নিশ্চয়ই লিখবো।

কখনও কখনও মনে মনে বলি, বাঃ বেশ, বেশ, কলকাতা শহরের উন্নতির জন্য আপনি নিজে কিছু করবেন না, শিক্ষাব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘোচাবার জন্য আপনি নিজে কোনও উদ্যোগ নেবেন না, মাছের দাম বাড়লেও আপনি ঠিকই কিনবেন, শুধু এই সব সমস্যা ঘোচাবার দায়িত্ব নিতে হবে বেচারি লেখকদের।

কিংবা, কখনও মনে মনে বলি, কলকাতার সমস্যা নিয়ে কি আমরা লিখিনি? অন্তত তিরিশ-চল্লিশবার আমি নিজেই লিখেছি। কী হয় লিখে? সবই আজকাল রাজনীতি-নিয়ন্ত্রিত, রাজনৈতিক দলের কর্তারা লেখকদের কথায় কর্ণপাত করেন না। মেট্রো রেল ময়দানের ওপর যেখানে-সেখানে যখন ঘরবাড়ি বানাতে শুরু করল, আমরা দাবি জানিয়েছিলুম যে, এ সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত নেওয়া উচিত। তারা গ্রাহ্য করেনি। কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার নাম যে হুটহাট করে পালটানো হচ্ছে, সে বিষয়ে লেখকদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত নয়?

সাহিত্যের কাছে মানুষ কী চায়?

এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ পাঠক সাহিত্য কী তাই-ই জানে না। তারা বই পড়ে, তারা গল্প-উপন্যাস পড়ে, তারা অনেক সময়ই বই পড়ার পর লেখকদের নাম মনে রাখে না, বা এক লেখকের সঙ্গে অন্য লেখকের রচনা গুলিয়ে ফেলে। সাহিত্য নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই, গল্পটা ভালো লাগলো কি ভালো লাগলো না, সেটাই একমাত্র বিচার্য। কোন্ গল্প-উপন্যাস সাহিত্য আর কোন্ গল্প-উপন্যাস সাহিত্যপদবাচ্য নয়, সে রকম বোঝার মতন পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা খুব বেশি নয়।

যারা সাহিত্য বোঝে না তারাই ছাপার অক্ষরের কাছ থেকে অনেক কিছু দাবি করে। তারা খবরের কাগজের দৈনন্দিন লেখা ও সাহিত্যিকের লেখার মধ্যে কোনও তফাত করে না। খবরের কাগজে প্রতিফলিত সমস্যাগুলি তারা সাহিত্যিকদের দিয়ে সমাধান করাতে চায়। রাজনৈতিক নেতাদের তারা হাতের কাছে পায় না। পেলেও মুখের ওপর কিছু বলার সাহস হয় না, কিন্তু সাহিত্যিকদের সব কিছু বলা যায়।

সাম্প্রতিক কালের গল্প-উপন্যাসে অনেক পাঠক-পাঠিকাই নিজের ছায়া দেখতে পায়। তাতে মনে হয় যে, সাহিত্যিকরা তাদের মনের কথা জানে। তা হলে সাহিত্যিকরা তাদের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ দূর করার দায়িত্ব নেবে না কেন?

অনেকেরই প্রশ্ন, সাহিত্যিকরা নানান রকম সঙ্কটের ছবি ফুটিয়ে তোলেন, কিন্তু কোনও সমাধানের পথ দেখান না কেন?

গল্পের নায়ক-নায়িকার শেষ পর্যন্ত বিয়ে দিয়ে দিলে সব কিছুর সমাধান হয়ে যায়। লেখকের কলমের খোঁচায় তা অনায়াসেই সম্ভব। কিন্তু গল্পের বেকার যুবক শেষ পর্যন্ত চাকরি পায় না। কেন লেখক তাঁর কলমের দয়ায় ওকে একটা ভালো চাকরি দিয়ে দেন না? লেখক কি কৃপণ, না নির্দয়? লেখক এই রাজ্যের চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ বেকারের চাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন?

একসময় সব সমস্যার সমাধানমূলক এক ধরনের গল্প-উপন্যাস লেখা বেশ চালু হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে। সব গল্পের শেষেই একটা লাল সূর্য উঠত। আশার প্রতীক। কিংবা বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের দল এক-কাট্টা হয়ে হৈ হৈ করে ছুটে গিয়ে জমিদার বা জোতদারের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে দিচ্ছে। কল্পনায় রাবড়ি খাওয়ার মতন এক কাল্পনিক বিপ্লব। কিংবা বিপ্লবের মেডইজি। সেই সব কৃত্রিম অবাস্তব রচনা এখন বিস্মৃতির আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তবতার একটা সম্পর্ক থাকেই। সাহিত্য কখনও হুবহু বাস্তব হয় না আবার বাস্তববিবর্জিতও হতে পারে না। প্রকৃত লেখক বাস্তবের ছবি আঁকতে বাধ্য, তা নিষ্ঠুর, নৈরাশ্যমূলক হলেও। এ রকম

ছবি আঁকার উদ্দেশ্য, পাঠকসমাজকে সচেতন করা, পাঠক যাতে সেই অবস্থাটা বদলাবার জন্য একবার অন্তত চিন্তা করে। সেইটুকুই যথেষ্ট। তার বদলে লেখক যদি একটা কষ্টকল্পিত ভবিষ্যতের ছবি এঁকে দেন, পাঠকের উদ্দেশ্যে একটা নীতি-লেকচার ঝাড়েন, তবে তা সাহিত্যও হয় না, তাতে পাঠকদের কোন লাভও হয় না।

জনপ্রিয় উপন্যাসে যেমন একটা প্রেমকাহিনীর ফর্মুলা থাকে, দুটি ছেলে একটি মেয়ে, একজন বড়লোক একজন গরিব, একজন দুশ্চরিত্র পরে ভালো হয়ে গেল, একজন সতী-লক্ষ্মী জননী দুঃখ পেয়ে পেয়েও শুধু আত্মত্যাগ করে গেল ইত্যাদি, সেই রকম আর এক ধরনের লেখায়, যাকে বলে প্রগতিশীল সাহিত্য, তাতেও বেশ একটা ফর্মুলা আছে। আজকাল ফিল্মে, থিয়েটারে, অনেক গল্প-উপন্যাসে এই ফর্মুলাটা চলছে। অজ পাড়াগাঁর একদল খুব নিপীড়িত মানুষ, হরিজন বা আদিবাসী, তারা এক জোতদার বা মিল-মালিকের অত্যাচারে ধুঁকছে, এর মাঝখানে রয়েছে একজন আদর্শবাদী ইস্কুল-মাস্টার, লেনিন-মার্ক্স-বুদ্ধ-রবীন্দ্রনাথ সব মিলিয়ে যার সৃষ্টি একজন ভণ্ড মন্ত্রী, একজন বিপ্লবে নিবেদিত-প্রাণ পার্টি কর্মী, একটা-দুটো খুন, হরিজন বা আদিবাসী পল্লীর অতীব তেজী ও সুন্দরী একজন রমণী, তারপর একটা মিনি-বিপ্লবের ইঙ্গিত।

শুধু সাদা বা শুধু কালো, এই দুটি রং সাহিত্যে একেবারেই চলে না। তবু পাপ-পুণ্য, প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল এইসব ছদ্মবেশে ওই সাদা-কালো রং বারবার ফিরে আসে, এসে সাহিত্যের নামে ছাপা কাগজের আবর্জনা বাড়ায়। আকাশের রামধনুর চেয়েও রস-সাহিত্যের রং অনেক বেশি, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীর চেয়েও অনেক বেশি সুর মিশলে সেই রচনা রসোত্তীর্ণ হয়।

শিল্পের জন্যই শিল্প, এই তত্ত্বটিকে ইদানীং অনেকেই বাতিল করতে চান, তা করুন, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে তার বক্তব্যটুকুই আসল, এই মত যাঁরা আঁকড়ে ধরতে চান, তাঁরা সাহিত্যের কিছুই বোঝেন না। সাহিত্যের মধ্যে লেখকের বক্তব্য যত নিরুচ্চার থাকবে ততই বেশি তা

পাঠকের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। সমস্ত লেখকই সামাজিক অসাম্য দূর করায় বিশ্বাসী, কিন্তু যে-সব কলমধারী চিৎকার করে সেই কথাটা বলতে চায় তারা তকমা-আঁটা বড় প্রগতিশীল বলে পরিচিত হতে পারে কিন্তু তাদের রচনার রস আমার কাছে গ্যাঁজানো মনে হয়। আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্ত, তাঁর কাজ ছিল সূক্ষ্ম সুতোর।

আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যখন দেখি কবিতার মধ্যেও অনেকে প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল চিহ্ন খোঁজে। শব্দ-সাহিত্যের মধ্যে কবিতাই সবচেয়ে সূক্ষ্ম। কবিতার মধ্যে বক্তব্যের অংশ অকিঞ্চিৎকর, শব্দ-ব্যঞ্জনাই তার প্রাণ। কবিতা অবশ্য বিনি সুতোর শব্দের মালা নয়, কবির একটা চিন্তার প্রতিফলন তাতে থাকেই, তার মধ্যে অনেকখানিই স্বপ্নদর্শনের মতন, তার লজিক সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু বক্তব্যটুকু ছেঁকে তোলা যায় একমাত্র অ-কবিতা থেকে। সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলা কবিতার মূল ধারা ব্যঞ্জনামূলক, বক্তব্যমূলক নয়।

বাংলা সাহিত্যের সত্যিকারের প্রাণের স্পন্দন টের পাওয়া যায় লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলি থেকে। কোন লিট্‌ল ম্যাগাজিনই তেমন দীর্ঘজীবী হয় না, কিন্তু স্রোত সব সময় অব্যাহত। এত দারিদ্র্য, এত হতাশার মধ্যেও যুবসমাজ সাহিত্যের জন্য প্রাণ পণ করে। সব লিট্‌ল ম্যাগাজিনের লেখাই রসোত্তীর্ণ হয় না, অনেকে হাত পাকাবার আগেই ছাপা লেখার আসরে অনধিকারীর মতন এসে পড়ে। কিন্তু সব মিলিয়ে বলা যায়, লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলিতে বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণাই কাজ করে যায়।

## উত্তম পুরুষ

বালিগঞ্জ স্টেশনের লেভেল ক্রসিং পার হচ্ছি, এমন সময় একটি লোক আমার চোখে চোখ ফেলে জিজ্ঞেস করলো, দাদা, ভালো আছেন?

লোকটি একটি ঝুড়িতে করে কাঁচা লঙ্কা বিক্রি করছে। এই স্টেশনের সামনের রাস্তার দু'পাশে অনেক অস্থায়ী সব্‌জীর দোকান বসে

রোজ। আমি এদিকে বাজার করতে আসি না, সুতরাং এদিককার কোনো দোকানদারের সঙ্গে আমার চেনাশুনো হবার কথা নয়। লোকটির মুখে তিন-চারদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথাটি বিরল, শুকনো গাল, একটি সম্পূর্ণ পোকায় খাওয়া চেহারা। গায়ে একটা নস্যি রঙের আলোয়ান। এই মানুষটিকে আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়লো না। তবু তার প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রতার হাসি মিশিয়ে বললুম, হ্যাঁ। আপনি ভালো তো?

লোকটি এবার জিজ্ঞেস করলো, আমায় চিনতে পারছেন তো?

একটু ইতস্তত করে বললুম, কোথায় দেখেছি ঠিক মনে পড়ছে না।

লোকটি বললো, মনে নেই? আমার নাম হেমন্ত গোলদার। সেই আপনি মরিচঝাঁপি দ্বীপে গিয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে একটা শিহরণ হলো, সব কথা মনে পড়ে গেল।

তিন বছর আগেকার কথা, সেটা ছিল সেপ্টেম্বর মাস। সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে কুড়ি-পঁচিশ হাজার জেদী রিফিউজি মাটি কামড়ে পড়ে আছে; সরকারের সঙ্গে লড়াই চলছে তাদের। দণ্ডকারণ্য থেকে প্রায় লাখখানেক রিফিউজি সেখানকার সেটেলম্যাণ্ট ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসে পশ্চিমবঙ্গে। তাদের দাবি ছিল এই যে তারা বাঙালী, তারা পশ্চিম বাংলাতেই থাকতে চায়। সুন্দরবনের কয়েকটি দ্বীপ তারা চেয়েছিল নিজেদের জন্য। তারা আর কোনো সরকারি সাহায্য চায়নি।

তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মোরারজী দেশাই, তিনি ঐ অবাধ্য উদ্বাস্তু-দের দাবি অথবা আবদার মেনে নিতে চাননি: পশ্চিম বাংলার রাজ্য সরকারও মোরারজীর সঙ্গে একমত হয়ে যে-কোনো উপায়ে ওদের দণ্ড-কারণ্যে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। সুন্দরবন এখন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত, সেখানে এতগুলো মানুষ গিয়ে আশ্রয় নিলে বাঘেদের শান্তি বিঘ্নিত হবে। তাছাড়া নির্বিচারে জঙ্গল কাটা হলে প্রকৃতির ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে যায়।

খিদের জ্বালায় এবং স্থানীয় লোকেদের প্রতিরোধে তারা অনেকেই

ফিরে যেতে বাধ্য হয়। শুধু ঐ কুড়ি-পঁচিশ হাজার মানুষ সুন্দরবনের এক দুর্গম দ্বীপে থেকে গিয়েছিল চার-পাঁচ মাস। সরকার ওদের তাড়াবার জন্য নানারকম প্রচার চালিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত বল প্রয়োগ করে ওদের উৎখাত করেছেন। কিন্তু একজন মন্ত্রীও ঐ মরিচঝাঁপি দ্বীপে পা দেননি কিংবা ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসেননি।

অনেকের মতন আমারও ধারণা ছিল যে দণ্ডকারণ্য ছেড়ে এসে ঐ উদ্বাস্তুরা অন্যায় করেছে। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা সমস্ত উদ্বাস্তুদের বোঝা একা পশ্চিমবঙ্গকে বইতে হবে কেন? এদের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারেরই তো নেওয়া উচিত। তবে একটা ব্যাপারে খটকা লেগেছিল। এত বছর বাদে দণ্ডকারণ্য ছেড়ে ওরা চলে এলো কেন? সেখানে ওরা ক্যাশ ডোল পেত, অনেকে জমি ও লাঙল গরু পেয়েছিল, তবু সেই সব ছেড়ে ওরা আবার অনিশ্চয়ের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল কোন্ কারণে?

কাগজে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের নানা রোমহর্ষক কাহিনী পড়তুম। সরকারের কাছ থেকে কোনো রকম সাহায্য না পেয়েও তারা চার-পাঁচ মাস ধরে বেঁচে আছে। পুলিস তাদের নৌকো ডুবিয়ে দেয় বলে সেখান-কার শুধু মেয়েরা নৌকো চালিয়ে এসে পুলিসদের চ্যালেঞ্জ জানায়। মাঝরাত্রে তারা জঙ্গল ছেড়ে সভ্যতার দিকে আসে পানীয় জল নিয়ে যাবার জন্য। তাই একদিন মনে হলো, নিজের চোখে গিয়ে ওদের অবস্থা দেখে আসি।

এ বিষয়ে আমার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন জ্যোতির্ময় দত্ত। এই দুর্দান্ত যুবকটি ভয় কাকে বলে জানেই না। একদিন আমি তাঁর সঙ্গী হয়ে পৌঁছোলুম হাসনাবাদে। সেখান থেকে প্যাসেঞ্জার লঞ্চে কয়েক ঘণ্টার যাত্রায় মরিচঝাঁপির কাছাকাছি যাওয়া যায়। কিন্তু পৌঁছে বুঝলুম, আমরা ভুল দিনে এসেছি। কারণ, পুলিস তখন ঐ অবাধ্য উদ্বাস্তুদের শায়েস্তা করবার জন্য ফাইন্যাল অ্যাকশনের জন্য তৈরী হচ্ছে। সমস্ত সারভিস লঞ্চ সরকার রিকুইজিশান করে নিয়েছে, কোনো সাংবাদিককেও ওদিকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। আমাদেরও যাবার কোনো উপায় নেই।

একজন স্থানীয় লোক আমাদের বললো, মাইল দশেক দূরে হ্যাজাট বলে একটা জায়গা আছে, সেখান থেকে সুন্দরবনের দিকে যাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। হ্যাজাট বলে কোনো জায়গার নাম আমি আগে শুনিইনি। সেখানে পৌঁছে দেখলুম, সেটা রীতিমতন একটা বন্দর। সেখানে একটি জেটি আছে। সুন্দরবন থেকে নানারকম জিনিস স্টিমার, লঞ্চ বা নৌকোয় এই হ্যাজাট বন্দর এসে তারপর কলকাতার দিকে যায়। সেখানেও অবশ্য সেদিন সব লঞ্চ-স্টিমার বন্ধ। একমাত্র নৌকো ভাড়া করে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু জোয়ার না এলে নৌকো ছাড়বে না, জোয়ার আসবে রাত দুটোর সময়।

জ্যোতির্ময় দত্ত তাতেই রাজি। সেখানকার লোকেরা অবশ্য আমাদের নিবৃত্ত করবার অনেক চেষ্টা করলো। আমাদের মতন নতুন লোকদের পক্ষে মধ্যরাত্রে নৌকো যাত্রা অত্যন্ত বিপজ্জনক। পাঁচ টাকা দশ টাকা বা শুধু পরনের জামাকাপড়ের জন্য এখানে ডাকাতি ও খুন হয়। সীমান্ত এলাকা, তাই বাংলাদেশের ডাকাতরা এদিকে ডাকাতি করে ওদিকে পালিয়ে যায়। এদিকের ডাকাতরা বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকে ডাকাতি করে আসে। নদীর নাম রায়মঙ্গল। বর্ষার পর তার চেহারা অতি ভয়ঙ্কর, অন্য পার দেখা যায় না। এখানেও হঠাৎ নৌকো উল্টে গেলে সাঁতার জেনেও লাভ নেই, প্রাণে বাঁচা যায় না, প্রবল স্রোতে টেনে নিয়ে যায় সমুদ্রের দিকে। তাছাড়া এর মধ্যে আছে হিংস্র কামঠ।

আমি তেমন সাহসী লোক নই। কিন্তু কোনো কোনো দুঃসাহসী লোকের সংস্পর্শে এলে অনেক কাপুরুষও অকস্মাৎ সাহসী হয়ে ওঠে। তাই আমি জ্যোতির্ময় দত্তের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলুম। হ্যাজাট-এর সামান্য দু'তিনটি দোকান সন্ধ্যের পরই বন্ধ হয়ে যায়। সেই রকম একটি চায়ের দোকানের টেবিলে আমরা ঘুমিয়ে নিলুম রাত দুটো পর্যন্ত।

তারপর আমাদের নৌকো যখন ছাড়লো, তার একটু পরেই শুরু হলো বৃষ্টি। খোলা নৌকো। সুতরাং বসে বসে গরু-ছাগলের মতন ভেজা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। এ সেই বৃষ্টি, যা পরবর্তী সাতদিনের মধ্যে আর থামেনি। সেই বৃষ্টির জন্য সে বছর কলকাতা

শহরও বন্যার জলে ডুবে গিয়েছিল অনেকখানি।

দশ ঘণ্টা পরে মরিচঝাঁপির কাছে পৌঁছে আমরা এমন একটি দৃশ্য দেখলুম, যে-রকম দৃশ্য আগে শুধু বিদেশী সিনেমাতেই দেখেছি। প্রায় সাতাশখানা লঞ্চ ঘিরে আছে মরিচঝাঁপি দ্বীপ, তাতে গিসগিস করছে পুলিস, তারা রাইফেল উঁচিয়ে আছে। ঠিক যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্র, তবে যুদ্ধ তখনো শুরু হয়নি, মাইক্রোফোনে উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে প্রলোভন দেখিয়ে বলা হচ্ছে, যে যে ফিরে যাবে, তারা প্রত্যেকে পাবে সাতশো টাকা, এক মণ চাল, এক জোড়া গরু ইত্যাদি। এর উত্তরে উদ্বাস্তুরা দিচ্ছে অশ্রাব্য অশ্লীল গালাগালি।

আমরা সেই দ্বীপে পা দেবার পর তারা আমাদেরও খুব সন্দেহ করেছিল। প্রথমে ভেবেছিল, আমরা সরকারি গুপ্তচর। লাঠি উঁচিয়ে মারতে এসেছিল আমাদের। অতিকষ্টে তাদের বোঝানো হয় যে আমরা নিরীহ দর্শক মাত্র।

তারা আমাদের জানালো যে পূর্ব-পাকিস্তানে তারা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। কিন্তু দণ্ডকারণ্যে তারা তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর। স্বাধীনতার এত বছর পরেও তাদের উদ্বাস্তু পরিচয় ঘুচবে না কেন? সেখানকার স্থানীয় আদিবাসী উপজাতিরা তাদের শত্রু বলে মনে করে। তারা থানায় কোনো নালিশ জানাতে গেলে পুলিস তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখলেও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্র সরকার তাদের চাকরি দেয় না। তারা কতকাল এই অবস্থা সহ্য করবে? এই সুন্দরবনে এসে তারা স্বাবলম্বী হতে চায়। এখানে মাছের ভেড়ি তৈরি করে তার উপার্জনেই তাদের সংসার চলে যাবে। তারা আর সরকারের মুখাপেক্ষী থাকতে চায় না। উদ্বাস্তু পরিচয়টাও আর বহন করতে চায় না। তারা এখন গাছ কেটে বিক্রি করছে বটে, আবার নতুন গাছও লাগাচ্ছে। একজন বললো দেখুন এখানে মেয়েরা আর বাচ্চারাও পরিশ্রম করছে, এবং নিজে উপার্জন করছে বলে তাদের মুখে একটা আত্মসম্মানের ভাব ফুটে উঠেছে।

আর একজন বললো, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ইত্যাদি

উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কলকাতা বা কাছাকাছি জায়গায় আশ্রয় পেয়ে গেছে। আর সিডিউল্‌ড কাস্ট কিংবা তথাকথিত নিচু জাতের মানুষদের আপনারা ঠেলে পাঠাতে চান দণ্ডকারণ্যে, তাই না?

এর পরের ঘটনা সবারই জানা। মরিচঝাঁপি দ্বীপ এখন জনশূন্য। সুন্দরবনের বাঘেরা এখন শান্তিতে আছে। সেখানকার বনসম্পদ রক্ষার ভার আমরা কাঠের চোরাকারবারিদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

তবে আমি শুনেছিলুম, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা সবাই দণ্ডকারণ্যে ফিরে যায়নি শেষ পর্যন্ত। অনেকে পালিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর পশ্চিম বাংলার জণারণ্যে মিশে গেছে।

তাদের একজনকে দেখলুম আজ। মরিচঝাঁপি দ্বীপটি ছিল কাদায় থকথকে। আমি বারবার আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলুম, তখন এই হেমন্ত গোলদার আমার হাত ধরে সাহায্য করেছিল। এখন সে কাঁচা লঙ্কা বিক্রি করছে। সাধারণত কাঁচা লঙ্কা কেউ পনেরো কুড়ি পয়সার বেশি কেনে না। সেই হিসেবে তার ঝুড়িতে যা লঙ্কা আছে তার দাম হবে বড় জোর পাঁচ টাকার। এই পাঁচ টাকার জিনিস বিক্রি করে তার কত লাভ থাকতে পারে, যাতে তার সংসার চলে যায়। এ এক এমন ধাঁধা যার উত্তর জানা কোনোদিনই সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।

## সমরেশদা

সমরেশ বসু আমাদের ঠিক এক দশক আগের লেখক। অর্থাৎ আমরা যখন সন্থ স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে এসেছি তখন তিনি উদীয়মান তরুণ লেখক। 'পরিচয়' কিংবা 'দেশ' ছাড়াও ছোটখাটো পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরুচ্ছে। যতদূর মনে পড়ে, তাঁর 'অকাল বৃষ্টি' নামে একটি দুর্ধর্ষ ছোট গল্প কোনো ছোট পত্রিকাতেই প্রথম ছাপা হয়েছিল। আমরা তখন কবিতা নিয়ে মাতামাতি করছি, কবিতার পত্রিকা প্রকাশ করছি; কবিরা সাধারণত গদ্য রচনা বিশেষ পড়ে না, কিন্তু আমি সব পত্র-পত্রিকায়

প্রতিটি রচনা তন্ন তন্ন করে পড়তাম এবং সমরেশ বসুর অগ্রগতি লক্ষ্য করেছি।

দেশ পত্রিকায় কালকূট নামে ধারাবাহিক উপন্যাস 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' প্রকাশের পরই তরুণ লেখক সমরেশ বসু হয়ে গেলেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। তখনকার খুব উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের প্রকাশক সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত 'বি-টি রোডের ধারে' উপন্যাসের লেখককে সোনার কলম পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করলেন, তারাশঙ্কর থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত খ্যাতনামা লেখকেরা সমরেশ বসুকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমাদের মতন কফি হাউসের ছেলেছোকরারা তাঁকে বরণ করে নিয়েছি আরও আগে।

কোনো লেখকের রচনা পড়ে মুগ্ধতা জাগলে সেই লেখকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও জানতে ইচ্ছে করে। সমরেশ বসু সম্পর্কে তখন নানা ধরনের সত্য-মিথ্যা গল্প প্রচলিত ছিল। কফি হাউসের আড্ডায় তিনি বিশেষ আসতেন না কিন্তু কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় তাঁকে দেখা যেত প্রায়ই। দৈর্ঘ্যে কিছুটা খাটো কিন্তু রূপবান পুরুষ। মুখখানি সহাস্য। তাঁর প্রতি-দিনের পোশাকই নজরে পড়ার মতন। যদিও তাঁর প্রথম যৌবন বেশ দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে, সেই সময়েও তাঁর অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, কলকাতায় তাঁর কোন বাসস্থান ছিল না, নৈহাটী থেকে ট্রেনে যাতায়াত করতেন, কিন্তু একজন মানুষই থাকে এরকম পোশাকের সুরুচি সম্পর্কে সজাগ। তাঁকে আমি কোনোদিনই ময়লা কিংবা ইস্ত্রিনষ্ট জামাকাপড় পরতে দেখিনি, সুদৃশ্য পোশাকে তাঁকে মানাতোও খুব।

১৯১৫ সালে শারদীয় দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বিবর'। সঠিক বছরটা আমার মনে থাকবার কারণ, পরের বছরই ঐ শারদীয় সংখ্যায় একটি উপন্যাস লিখে আমি অনধিকারীর মতন গদ্যের জগতে অনুপ্রবেশ করেছিলাম। 'বিবর' প্রকাশিত হবার পর সন্তোষকুমার ঘোষ 'দেশ' পত্রিকায় একটি চিঠি লিখে সেই উপন্যাসের অজস্র প্রশংসা করে জানান যে, তার মতে বিবর দশটি শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাসের অন্যতম। প্রায় সমসাময়িক কোন লেখক সম্পর্কে অপর প্রতিষ্ঠিত কোন লেখকের

এরকম লিখিত উচ্ছ্বাস সাহিতের ইতিহাসে বিরল। তারপরেই 'বিবর'কে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঝড় ওঠে। পরের বছর 'প্রজাপতি' প্রকাশিত হলে সেই বিতর্ক অন্যদিকে মোড় নেয়। সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল বিষয়ে আলোচনা সভা বসে বহু জায়গায়—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভারতী, এবং অন্যত্র। কেন জানি না, সেই সব সভাতে আমারও ডাক পড়তে লাগলো, সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়টা জমে ওঠে। যদিও এর আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছে কয়েকবার, সাগরময় ঘোষের দফ্তরে, সন্তোষকুমার ঘোষের আড্ডায়। একবার সন্তোষকুমার আমাকে প্রায় জোর করেই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন নৈহাটিতে সমরেশ বসুর বাড়িতে, তাঁর প্রথমা পত্নী গৌরী দেবীর একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সেদিন বার্ষিক উৎসব, সাগরময় ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র প্রমুখ আরও অনেকে গিয়েছিলেন। প্রায় সারারাত খুব হৈ-চৈ হয়েছিল।

শ্লীল-অশ্লীল আলোচনা সভাগুলিতে সমরেশ বসু প্রতিপক্ষের আক্রমণের উত্তর দিতেন জোরালো যুক্তি দিয়ে, আমাদের দেশের নির্যাতিত নিরন্ন মানুষদের পোশাক ও মুখের ভাষায় উদাহরণ তুলে ধরতেন প্রায়ই। আমি আমার বক্তব্য সেরে দিতাম অনেকটা ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। আমার ধারণা, বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা নিয়ে অশ্লীলতার প্রসঙ্গই ওঠে না। 'বিবর' 'প্রজাপতি'কে অশ্লীল বলা হলে 'ট্রপিক অফ ক্যানসার'কে কী আখ্যা দেওয়া হবে? কিন্তু এই সব আলোচনা সভা এক এক সময় বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতো, রাজনীতিতে তখন একটা চরমপন্থী হাওয়া বইছে, বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দু'দিকের রাজনীতিই চলে যাচ্ছে চরম পন্থার দিকে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, সাহিত্য-সংস্কৃতির নীতিবাগিশতার ব্যাপারে দু'পক্ষই একমত। সমরেশ বসুকে কেউ কেউ শারীরিক আক্রমণেরও ভয় দেখিয়েছিল, কিন্তু তিনি অকুতোভয়, তিনি আবার লিখলেন 'স্বীকারোক্তি', 'পাতক'।

সেই সভাসমিতি থেকে বেরিয়ে কোথাও কোথাও আমরা বসতাম একসঙ্গে। তাঁর চেনাশুনোর পরিধি অনেক বড় হলেও তিনি আকৃষ্ট

হলেন আমাদের আড্ডায়। মাঝে মাঝেই চলে আসতেন। একদিন তিনি- আমাকে বলেছিলেন, আপনাদের আড্ডায় পরনিন্দা-পরচর্চা বিশেষ হয় না, বড় কাগজের লেখক আর ছোট কাগজের লেখক বলে কোনো তফাত ছিল না, আমি নিজেই তখনো প্রধানতঃ ছোট কাগজেরই লেখক এবং একটি ছোট পত্রিকার সম্পাদক। রাত্রের দিকে আমরা দল মেলে তাঁকে পৌঁছে দিতাম শিয়ালদা স্টেশনে, তিনি লাস্ট ট্রেনে নৈহাটি ফিরতেন।

কিছুদিন পর তিনি বালিগঞ্জ স্টেশান রোডে ছোট একটি ফ্ল্যাট নিলেন, সেটাই হলো কলকাতার তাঁর প্রথম আস্তানা। দ্বিতীয় পত্নী ধরিত্রী অর্থাৎ টুনিকে নিয়ে তাঁর ছোট সংসার। সেই প্রথম দেখি একজন বড়ো মাপের লেখকের দৈনন্দিন সাহিত্যচর্চা। প্রত্যেকদিন সকালবেলা নিয়ম করে লিখতে বসতেন, দুপুরে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও খালি গায়ে বসে লিখে যাচ্ছেন, কোনো কোনো দিন আড্ডার ঝোঁকে দুপুরের দিকে চলে গেছি তাঁর ওখানে, তিনি খানিকটা অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বলতেন, এখন যে ভাই লিখছি! অর্থাৎ স্পষ্ট চলে যাবার ইঙ্গিত! লেখাটা যেন তাঁর প্রতি-দিনের সাধনা ও যাঁরা অফিসে কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে কাজে ফাঁকি দেন, কারণ কাজটা তাঁদের নিজস্ব নয়। অন্য একজনও সে কাজ করে দিতে পারে, কিন্তু লেখক শিল্পী-বৈজ্ঞানিকদের কাজে ফাঁকি দেবার উপায় নেই।

অনেকের ধারণা, সাহিত্য রচনা বুঝি একটা প্রেরণার ব্যাপার। যখন-তখন লিখতে বসলেই কি লেখাযায়! লেখা যখন মাথায় আসবে তখনই তো লিখতে বসা হবে? কিন্তু প্রেরণা জিনিসটা ভূতের মতন যখন-তখন মাথায় এসে ভর করেনা। সাদা পৃষ্ঠার সামনে বসে তার নিঃশব্দ বন্দনা করতে হয়। লেখকের কাছে যে কোন রচনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হলো প্রথম লাইনটা। কখনো কখনো পথ চলতে চলতে বিদ্যুৎ ঝলকের মত সেই লাইনটা মাথায় আসতে পারে না, আবার অনেক সময় হারিয়েও যায়। সাদা পৃষ্ঠাই সেই লাইনটি খুঁজে পাবার প্রধানতম প্রেরণা। সেই জন্যই, প্রতিদিনই লিখতে না পারলেও বড় লেখকেরা নিয়মিত লেখার টেবিলে বসেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখতে বসতেন প্রত্যেকদিন ভোরবেলা।

সমরেশ বসুকে চোখের সামনে সেরকম একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখেছি।

তিনি ঠিকই করে ফেলেছিলেন যে সাহিত্যকেই সম্বল করে কাটিয়ে দেবেন সারা জীবন। কোনো চাকরিবাকরিতে সময় নষ্ট করবেন না। এই সিদ্ধান্ত সঠিক এবং দুঃসাহসিক। গান বাজনা ছবি আঁকা, সাহিত্য চর্চা এগুলি চব্বিশ ঘণ্টারই কাজ, একজন শিল্পীর পক্ষে চুপ করে বসে থাকা বা আপাত আলস্যও খুব প্রয়োজনীয়, কিংবা ভ্রমণ কিংবা অন্য কোনো সখের চর্চা কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিছক শিল্প সাহিত্যের জন্য নিবেদিত হলে এদেশে জীবিকা অর্জন করা যায় না। চিত্রকরকে নিযুক্ত হতে হয় ওষুধ কম্পানিতে। কবিকে সংবাদপত্র অফিসে কলম ক্ষইয়ে দিতে হয়, দেবব্রত বিশ্বাসের মতন গায়ককে আমি দেখেছি ইনসিওরেন্স কম্পানির অফিসে হিসেবপত্তর দেখাশুনার চাকরিতে। পুরোপুরি সাংসারিক দায়িত্ব নিয়েও শুধু বাংলা লিখে জীবন যাপনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন এক সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের চোখে দেখা সময়ে সমরেশ বসু। আমাদের সঙ্গে যখন পরিচয়, তখনও সমরেশ দারিদ্র্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছেন। সেইজন্য তাঁকে লিখতে হয়েছে প্রচুর, স্বনামে এবং কালকূট নামে ছাড়াও ভ্রমর ছদ্মনামেও তিনি লিখেছেন প্রচুর, সব লেখাই যে উৎকৃষ্ট হয়েছে তা বলা যায় না, এত লিখলে তা সম্ভবও নয়। আমাদের দেশে সমালোচকরা এমনই অদ্ভুত, একজন লেখকের দশটা লেখার মধ্যে যদি চারটে খুব ভালো হয়, তিনটে মাঝারি আর তিনটে নিরেশ, তা হলে সমালোচকেরা প্রথম চারটি উপেক্ষা করে শেষের তিনটি নিয়েই হুল্লোড় করেন। সমরেশ এইসব সমালোচকদের কখনো গ্রাহ্য করেননি। তার চেয়েও বড় কথা, সারা বছর যাঁকে এত লিখতে হয়, সেই লেখকও প্রত্যেক বছরই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কিছু লেখার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন এবং সার্থক হয়েছেন।

জীবন যাপনের জন্য এত বেশী লিখতে হলেও তিনি কখনো দাঁতে দাঁত চেপে লেখেননি। তাঁর কমিটমেণ্ট ছিল নিজের কাছে, মহাকালের দিকে তিনি অবহেলার সঙ্গে টুসকি মেরেছেন। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পরে সন্ধ্যেবেলা তিনি অন্য মানুষ। আমি যতদূর জানি, পারতপক্ষে

তিনি সন্ধ্যের পর কলম ধরতেন না। শুনেছি সম্পূর্ণ মহাভারতের বঙ্গানুবাদক এবং টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মশাইও সূর্যাস্তের পর মানুষের মেধাও ঢলে পড়ে মনে করে সন্ধ্যের পর কিছু লিখতেন না। নৈহাটির কায়স্থ ঔপন্যাসিকটিও এই দিক থেকে ছিলেন প্রাচীন ব্রাহ্মণদের অনুসারী। সন্ধ্যের পর সমরেশ বসু ছিলেন অন্য মানুষ। সেজেগুজে বেরুতেন, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য তাঁর প্রাণ আনচান করতো, আড্ডার সঙ্গে সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, তর্কাতর্কি, গান, কখনো কখনো নাচও। টপ্পা অঙ্গের পুরনো বাংলা গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে তিনি পরঙ্গম ছিলেন, খুব ফূর্তি হলে দু'একটা লৌকিক নৃত্যেও মেতে উঠতেন। কোনো সন্ধ্যায় উনি চুপচাপ বাড়ি বসে থাকলে ওঁর স্ত্রী টুনি ভয় পেয়ে যেতেন। তাহলে কি মানুষটার অসুখবিসুখ হলো নাকি?

বাংলাদেশ যুদ্ধের বছরে আমরা সবাই উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলাম। সেই যুদ্ধের শেষের দিকে আমরা উত্তেজনার আতিশয্যে সংবাদপত্র অফিসে রাত্রি ভোর করেছি। সংবাদপত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও সমরেশ বসুও আসতেন, তাঁর জন্ম পূর্ব বাংলা, শৈশব কেটেছে ঢাকা শহরে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে তিনি দারুণ আগ্রহী ছিলেন। তারপর আমরা সদলবলে গেলাম স্বাধীন বাংলাদেশে, সেখানে পেয়েছি সমরেশ বসুর প্রবল যৌবনময় সান্নিধ্য। তখন বাংলা সাহিত্যে কোনো রাজা-বাদশা নেই। সমরেশ বসুকেই মনে হতো যুবরাজ। দু' দিকের বাংলাসাহিত্যে অনুরাগীদেরই তিনি পরম প্রিয়। যিনি 'কোথায় পাবো তারে' লিখেছেন, তিনিই লিখেছেন 'গঙ্গা' 'মানুষ রতন' কিম্বা 'পাড়ি'—এর মতন গল্প তিনি অবহেলায় লিখে ফেলেছেন একদিনে।

এর কয়েক বছর পর, আমরা যখন কবিতার 'কৃত্তিবাস' পত্রিকটিকে সব-মেলানো মাসিক কবিতা গদ্যের পত্রিকার রূপ দেবার চেষ্টা করছি, তখন তিনি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, আমি এই কাগজে ধারাবাহিক উপন্যাস লিখবো। আমাদের সেই অব্যবসায়িক পত্রিকায় টাকা-পয়সা দেবার কোনো প্রশ্ন ছিল না। আর সেই সময়ে সমরেশ বসু প্রত্যেক জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকায় অতি আরাধনীয় লেখক, অনেকেই তাঁর

লেখা সাধ্যসাধনা করেও পায় না, তবু তিনি কৃত্তিবাসে নিজের থেকেই লিখতে চেয়েছিলেন এবং যথাসময়ে ইনস্টলমেণ্ট দিতেন।

এই রকম একটা সময়েই তাঁর প্রথম হৃদরোগ হয়। এমন কিছু গুরুতর আঘাত নয়, তবু কোন অতি সাবধানী চিকিৎসক তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁর পক্ষে সিঁড়ি ভাঙা একেবারেই উচিত নয়। কোনো একতলা বাড়িতে তাঁর থাকা দরকার। ততদিনে তাঁর কলকাতার সংসার বালিগঞ্জ স্টেশান রোডের অ্যাপার্টমেণ্ট ছেড়ে উঠে এসেছিল সার্কাস রোঞ্জের দোতলা ফ্ল্যাটে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাঁকে সেই দোতলা ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে হবে ; এ ব্যাপারে চিকিৎসকদের বোধহয় আপত্তি ছিল। কিন্তু তক্ষুনি একতলার ঘর পাওয়া যাবে কোথায় ? কৃত্তিবাস পত্রিকা ও আমাদের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী কল্যাণ চৌধুরী তখন যোধপুর পার্কে নতুন বাড়ি বানিয়েছেন, বাড়িটা ফাঁকা, ব্যাপারটা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন, তাঁর সেই বাড়ির একতলার একটি ঘরে সমরেশকে রাখা হলো। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের যুবরাজ অসুস্থ সেজে সেরকম একটা ফাঁকা বাড়ির একতলার ঘরে থাকতে রাজি হবেন কেন ? দু'চার দিনের মধ্যেই তিনি ফিরে গেলেন পার্ক সার্কাসে তাঁর নিজস্ব লেখার টেবিলে। যাঁর হৃদয় ছড়িয়ে আছে গোটা বাংলাদেশে তথা সারা পৃথিবীতে, তিনি সামান্য হৃদরোগে কাতর হবেন কেন ? এরকমই সবাই ভেবেছিল। অচিরেই দেখা গেল সমরেশ রোগের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর লেখায় সামান্য মালিন্যও দেখা গেল না। জীবন যাপনে উদ্দামতা কিছুমাত্র কমলো না। শুধু সিগারেট ছেড়ে দেবার প্রচেষ্টায় তিনি প্রথম প্রথম আস্ত সিগারেট দু'টুকরো খেতেন, তারপর তাও ছেড়ে অন্যের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে এক-দু' টান দিতেন। দার্জিলিংয়ে আরেকবার অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তিনি ধূমপান একেবারেই ত্যাগ করেন। এইসব সময়েই লিখে যাচ্ছেন 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' 'মহাকালের রথের ঘোড়া' ও 'টানাপোড়েন'-এর মতন উপন্যাস।

আশির দশকের গোড়ার দিকে আমরা বুধ সন্ধ্যা নামে একটি ক্লাবের পত্তন করি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আড্ডা, হাসি-ঠাট্টা, গল্প-কবিতা,

পাঠ, পানাহার, প্রকাশে পরচর্চা এবং সামান্য কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন। আমরা নাটক অভিনয়ের চ্যারিটি শো করে কোনো কোনো সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। এই সংস্থার সভাপতি সাগরময় ঘোষ, সহ-সভাপতি সুবিনয় রায় এবং সমরেশ বসু সাগ্রহে হলেন কার্যকরী সমিতির সদস্য। আমাদের প্রথম নাটক রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'। নাটকের অভিনয়ের চেয়েও দীর্ঘকালীন মহড়া অনেক বেশী উপভোগ্য, আমরা মহড়াই দিয়েছিলাম প্রায় এক বছর ধরে, সমরেশ নিয়েছিলেন মন্ত্রীর ভূমিকা, নিজের গরজে নিয়মিত আসতেন, বড় সুন্দর কেটেছিল সেই মহড়ার দিনগুলি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র সদনে দু'রাত্তির অভিনয়ে সাগরময় ঘোষ যখন মঞ্চে সংলাপ বলছেন সেই সময় অন্তরাল থেকে অত্যুৎসাহী একজন নির্ধারিত সময়ের আগেই আগুন! আগুন! বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, সাগরময় ঘোষ তা শুনে সংলাপ বানিয়ে দিলেন, একি, এ সময়ে তো আগুন লাগার কথা নয়, কি হলো দেখি তো, বলে স্মার্টলি বেরিয়ে এলেন ; নাটকের মূল চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগী-বেশী বুদ্ধদেব গুহ চমৎকার গান গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন এবং মন্ত্রীবেশী সমরেশ বসু পার্ট ভুলে গিয়ে দু-তিন পাতা ডিঙিয়ে সংলাপ বলে বিপদে ফেলে দিলেন তাঁর সহ অভিনেতা জয়ন্ত সেনকে। দ্বিতীয় রাতে এসব কিছুই হয়নি, সবই একেবারে নিখুঁত। কিন্তু যাঁরা দু'বারের অনুষ্ঠানই দেখেছিলেন, তাঁদের মতে প্রথম রাতের সব কিছু মিলিয়েই অভিনয় হয়েছিল অনেক বেশী উপভোগ্য।

মঞ্চ অভিনয়ের সহজাত গুণ ছিল সমরেশ বসুর। তাঁর প্রতিভা যে কোনো দিকেই বিকশিত হতে পারতো। বুধসন্ধ্যার পরবর্তী নাটক-গুলিতেও তাঁর অংশ নেবার ইচ্ছে ছিল খুবই, কিন্তু তাঁর শরীর তাঁর মনোবলের সঙ্গে আর তাল দিতে পারছিল না।

আমরা যখন বুধসন্ধ্যার নাটক নিয়ে হৈ-চৈ করছি, সেই সময়েই তিনি তৈরী হচ্ছেন শিল্পী রামকিংকর বেইজের জীবন নিয়ে একটা কিছু লেখার জন্য। প্রথমে ঠিক করেছিলেন জীবনী লিখবেন। রামকিংকর

তখনও জীবিত, তাঁর সঙ্গে বার বার সাক্ষাৎকার হচ্ছে সমরেশ বসুর। রামকিংকরের জীবিত কালেই লেখাটি প্রকাশিত হবার কথা ছিল। কিন্তু তখন স্বয়ং লেখকেরই স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো নয়, সুতরাং তিনি বেশ খানিকটা না লিখে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের জন্য দেবার সাহস পাচ্ছিলেন না। তিনি লিখে চলেছেন, এরই মধ্যে রচনার নায়কের আকস্মিক মৃত্যু। পি. জি. হাসপাতালের গেটে রামকিংকরের মৃতদেহ যখন বার করা হচ্ছে, তখন সমরেশ বসুকে যেন ভেঙে পড়তে দেখেছি। এ যেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির এক চিরন্তন সম্পর্কের ট্রাজেডি। রামকিংকরের এরকম সকৌতুক প্রস্থানে সমরেশ যেন প্রচণ্ড অভিমান বোধ করছিলেন।

তারপরেই ঠিক হয়, তিনি রামকিংকরের বস্তুনিষ্ঠ জীবনী রচনার বদলে তাঁর জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করবেন।

'দেশ' পত্রিকায় 'দেখি নাই ফিরে' ছাপা হতে শুরু করে '১৬ সাল থেকে, তারও বছর দু-এক আগে তিনি ঐ রচনার ছ'খানা ইনস্টলমেণ্ট আমাকে পড়তে দেন। এটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি সমরেশ বসু, প্রথম থেকেই তাঁর রচনা প্রেসে পাঠানো হয়, আমরা ছাপা হবার পর পড়ি। কিন্তু রামকিংকর নিয়ে লেখার সময় তিনি অসম্ভব খুঁতখুঁতে হয়ে পড়েছিলেন, প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, এবং শারীরিক অনিশ্চয়তার কারণে প্রায়ই বলতেন, প্রত্যেক সপ্তাহে লিখে দেবার সাহস আর আমি করি না। আগে অনেকখানি লিখে নিতে চাই। নতুন বিষয় নিয়ে লিখছেন বলেই হয়তো তিনি প্রথম কিছুটা অংশ আমাকে পড়িয়ে মতামত চেয়েছিলেন। তিনি শুরু করেছিলেন ক্লাসিকেল স্টাইলে। একেবারে রামকিংকর বেইজের জন্মবৃত্তান্ত থেকে। আমি আশা করেছিলাম, এই রচনা শুরু হবে রামকিংকরের যৌবন থেকে, যখন তাঁর শিল্পজীবনের শুরু। যখন থেকে তাঁর প্রতি আমাদের আগ্রহ জাগে। এর আগের অংশ নিছক তথ্যের খাতিরে কোন এক জায়গায় ফ্ল্যাসব্যাকে বলে নিলেই হলো।

নতুন দাঁত ওঠা শিশু যেমন সবকিছু কামড়াতে যায়, তেমনি হঠাৎ

কোনো ভালো বই পড়লে আমার কাছাকাছি সকলকে জানাতে ইচ্ছে করে। এরই মধ্যে আমি বিদেশ থেকে একটি বই নিয়ে আসি, যেটি অগুপ্ত রঁত্যার জীবনী-উপন্যাস, নাম, 'নেকেড কেম আই'। খুবই নাটকীয় ও শিল্প-সমন্বিত সেই রচনা। একদিন আমার বাড়ির সান্ধ্য আড্ডায় আমি সাড়ম্বরে সেই বইটির আলোচনা শুরু করি। তখনো রঁত্যার কিছু ব্রোঞ্জ কাস্টিং-এর প্রদর্শনী হয়নি কলকাতায়, অনেকেই রঁত্যার শিল্পকীর্তি এবং ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে খুব বেশী অবহিত নন। কিন্তু সমরেশ বসু যেহেতু ভারতের একজন প্রথম শ্রেণীর ভাস্করকে নিয়ে লিখছেন, তিনি রঁত্যা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতেন নিশ্চিত, শুধু ঐ জীবনী-উপন্যাসটি দেখেননি। তিনি বইখানি আমার কাছে ধার চেয়েছিলেন। তারপর ঐ বইও সমরেশ বসুর প্রস্তাবিত উপন্যাস নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়। অন্য অনেকের সঙ্গেই তিনি এই উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আরম্ভের অংশটি বার বার নতুন করে লিখেছেন।

তিনি ব্যস্ত লেখক, 'দেখি নাই ফিরে'র প্রস্তুতি পর্ব এবং রচনার সময়েও তিনি অন্য অনেক উপন্যাস রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। আমাদের দেশে তো এমনটি হবার উপায় নেই যে একজন বড় লেখক শুধু একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী লেখা নিয়েই কয়েকটি বছর নিমগ্ন থাকবেন, তাঁকে আরও অনেক কিছু লিখতেই হবে। রামকিংকর বেইজকে নিয়ে সমরেশ বসু সেই কারণেই দেরি করে লিখতে শুরু করেছেন নিশ্চিত। সেইজন্যই এ আপসোস কিছুতে যাবার নয় যে, যে উপন্যাসের মালমশলা সংগ্রহের জন্য তিনি এত পরিশ্রম করলেন, রামকিংকরের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিতে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন আসাম-মণিপুর থেকে দিল্লি পর্যন্ত বারংবার, যে রচনাটি হতে পারতো তাঁর ম্যাগনাম ও পাস, সেটি তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না। তাঁর সঙ্গে দার্জিলিঙ গিয়ে সকালবেলা প্রাতরাশের সঙ্গে তাঁকে ছ'সাত রকম ওষুধ খেতে দেখেছি একসঙ্গে। অত ওষুধ দেখে আমাদের চোখ ছানাবড়া হবার উপক্রম! তখন হৃদরোগের চেয়েও তাঁর শ্বাসকষ্টই প্রবল। শ্বাসকষ্টের জন্য যাঁকে

অতগুলি ট্যাবলেট খেতে হয়, তাঁর পক্ষে তো পাহাড়ী ঠাণ্ডার জায়গায় যাওয়াই উচিত নয়। কিন্তু শরীরে অসুখ রইলেও তিনি অসুস্থ হয়ে থাকতে চাননি কিছুতেই। সব ব্যাপারেই তাঁর অদম্য উৎসাহ। সেবারের সেই দার্জিলিং-এর অনুষ্ঠানটির খানিকটা ঐতিহাসিক গুরুত্বও আছে। বছর তিনেক আগে দার্জিলিঙ শহরের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি উৎসব হয়, কলকাতা থেকে একদল সাহিত্যিক ও সঙ্গীত শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাঙালী ও নেপালী লেখক শিল্পীদের একসঙ্গে অনুষ্ঠান করার কথা। সেখানে গিয়ে দেখা গেল দার্জিলিং-এর নেপালী লেখকদের একজনকেও আমরা চিনি না, তাঁরাও আমাদের কারুর সম্পর্কে কিছু জানেন বলে মনে হলো না। একই পশ্চিমবাংলার মধ্যে থেকেও পরস্পরের মধ্যে এতখানি দূরত্ব! সেই অনুষ্ঠানে সমরেশ বসু নেপালী ভাষাকে অষ্টম তপসিলের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে প্রকাশ করলেন, পরদিন দার্জিলিং-এর নেপালী ভাষার পত্রিকায় তাঁর সেই বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছিল। এত করেও অবশ্য নেপালীদের মন পাওয়া যায়নি, পরে শুনেছি, দার্জিলিং-এর উৎসবে বাঙালী লেখক-শিল্পীদের আহ্বান করা হয়েছিল বলে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। যদিও সুভাষ ঘিসিঙের নাম তখন একবারও শোনা যায়নি। তারপর থেকে এ পর্যন্ত দার্জিলিং-এ বাঙালীদের আর কোনো প্রকাশ্য অনুষ্ঠান হতে পারেনি বোধহয়।

ষাট বছরে পা দিয়ে তিনি প্রথম বিদেশে যান, সোভিয়েত ইউনিয়নে, তাও মাত্র সাত দিনের জন্য, একটা বড় দলের সঙ্গে। '১৬ সালে যান ইউরোপ। পশ্চিম জার্মানি, পশ্চিম বার্লিন, পূর্ব বার্লিন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ডে আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমার গোপনে খুব কষ্ট হতো, মনের জোর ও শারীরিক অক্ষম। তার হাঁপ ধরে, একটু ঠাণ্ডা লাগলেই শ্বাসকষ্ট বাড়ে। ইউরোপের শহরগুলিতে ঠাণ্ডাও এড়ানো যায় না। না হেঁটেও কিছু দেখা যায় না। যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠতো তাঁর দুই ভুরুর মাঝখানে, এক এক সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি শান্ত গলায় বলতেন, আবার আসতে হবে, শরীরটা একটু সারিয়ে নিই, রামকিংকরের ওপর লেখাটা শেষ

করে নি, আবার আসব, সব ভাল করে দেখতে হবে।

শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন আশাবাদী, সম্ভবত শেষ নিশ্বাস ফেলার আগের মুহূর্তেও তিনি মৃত্যুকে বিশ্বাস করতে পারেননি।

## জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর চেহারা ও ব্যবহার ছিল অবিকল একজন খাঁটি লেখকের মতন। অর্থাৎ আমাদের মনের মধ্যে যে-রকম লেখকের ছবি থাকে। তিনি কোনো গল্পের নায়কের মতন রূপবান ও সুপুরুষ নন, তিনি বীর বা যোদ্ধাদের মতন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নন, রাজনীতিবিদ বা অধ্যাপকদের মতন তুখোড় বাক্যবাগীশ নন, জাদুকরের মতন মোহিত করে দিতে পারেন না। তাঁর শ্যামবর্ণ ছিপছিপে চেহারা, ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার মতন মানুষটি লাজুক স্বভাবের। তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে অন্য কেউ তাঁর দিকে তাকাবে না, কিন্তু তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখবেন সকলকে। এই সব মানুষই স্রষ্টা হন। কোঁকড়ানো চুল ও পুরু লেন্সের চশমা সমন্বিত মুখটি দেখলেই বোঝা যায়, এই মানুষটি সাধারণ নন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পুরোপুরি সাহিত্য জগতে ডুবে থাকা মানুষ। অর্থাৎ নারী, পুরুষ, শিশু, গাছপালা, গিরগিটি, শালিক, চড়ুই, পিঁপড়ে ইত্যাদি যা কিছুই দেখছেন, এই সব কিছুকেই ভাষার বন্ধনে বাঁধবার জন্য তাঁর মন সারাক্ষণ নিযুক্ত। সাহিত্য তাঁর জীবনে অতি তীব্র নেশার মতন। তিনি পাঠকদের মনোরঞ্জনের কথা চিন্তা করে লেখেননি, এমন কি অমরত্বও তাঁর লক্ষ্য ছিল না, সারা জীবন দুঃখ-কষ্ট ও পাঠকদের অবজ্ঞা সহ্য করেও লিখে যাবেন এই আশায় যে মৃত্যুর পরে তাঁর রচনার যোগ্য সমাদর হবে, এরকম রোমান্টিক ধারণাও তাঁর ছিল না। তিনি লিখতেন, তার কারণ লেখা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল না, এবং সমস্ত প্রকৃত লেখকেরই যেমন লেখাটাই জীবিকা হয়, তাঁরও শেষ পর্যন্ত

তাই হয়েছিল, অর্থাৎ তাঁর শরীর ও মন এই দুটিরই সমান টান ছিল সাহিত্যের জন্য। জীবনের অন্য কোনো দিকে তিনি কীর্তি স্থাপন করেননি, মনোযোগ দিয়ে সুষ্ঠুভাবে একটানা কোনো চাকরিও করতে পারেননি, তিনি শুধু সাহিত্য রচনা করে গেছেন। তাঁর রক্তক্ষরণ ও আয়ুক্ষরণে তাঁর রচনাগুলি এক একটি উজ্জ্বল মণি হয়ে উঠেছে।

তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার যেমন খেয়াল হয় সেই রকম লিখি। আমার যা মাথায় আসে, আমার যা ইচ্ছে হয়, যে-রকম খেয়াল হয়, সেই রকম লিখে যাই। খেয়াল কথাটার ওপর একটু জোর দিয়ে বলতেন। কোনো উপন্যাসই আগে থেকে ছক কেটে কিংবা প্লট ভেবে লেখেননি। একটা কোনো মুড বা বিশেষ একটা কোন চরিত্র কিংবা 'খেয়াল' নিয়ে লিখতে শুরু করেছেন। এই রকম পরিকল্পনাহীন একজন লেখকই কিন্তু প্রায় প্রথম থেকেই নিজস্ব একটা স্টাইল তৈরি করতে পেরেছিলেন। এটা বড় কম কথা নয়। তাঁর নিজস্ব ভাষা ব্যবহার এবং বিশেষ রকমের পর্যবেক্ষণ শক্তির জন্য তিনি বরাবরই আলাদা ধরনের লেখক। তাঁর প্রথম উপন্যাস সূর্যমুখী থেকেই তাঁর এই নিজস্বতা টের পাওয়া যায়। দ্বিতীয় যুদ্ধের বিপর্যস্ত জীবন নিয়ে তাঁর এই উপন্যাস রীতিমতো দুঃসাহসী।

কুমিল্লা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন তিনি। গ্রাম্য প্রকৃতি তাঁকে সারা জীবন ছাড়েনি. কিন্তু জীবন বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আশ্চয রকমের নাগরিক। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন প্রেমেন্দ্র মিত্রও তাঁকে এই কথা বলেছিলেন। কুমিল্লা থেকেই লেখা শুরু করেন তিনি, ডাকে লেখা পাঠাতেন, ছাপা হয়েছিল ঢাকার 'সোনার বাংলা' ও অন্য দু' একটি কাগজে, দেশ পত্রিকাতেও ছাপা হয় এই রকম ডাকে পাঠানো গল্প। ওঁর নিজের ভাষায়, "পাঠকদের স্বীকৃতি পাবার আগেই সম্পাদক ও অন্যান্য লেখকদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।" কলকাতায় এসে উনি বেঙ্গল ইমিউনিটি কম্পানিতে কেরানীগিরি করতেন, সেখানকার প্রচার সচিব ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তিনি ঐ নবীন লেখককে ডেকে আলাপ

করে বলেছিলেন, তোমার লেখা পড়েছি। তুমি গ্রাম থেকে এসেছো। আগে কখনো কলকাতা দেখোনি? অথচ শহর সম্পর্কে তোমার কনসেপশান তো খুব পরিষ্কার!

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে মিশিয়ে সৌন্দর্য-সন্ধানই ছিল তাঁর লেখার মূল সুর। তাঁর প্রকৃতি কিন্তু বিশাল কোনো পাহাড়, নিবিড় দুর্গম অরণ্য বা দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র নয়। যেমন তাঁর রচনার মানুষরাও অতি সাধারণ, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, সেই রকম তাঁর প্রকৃতিও ছোটখাটো ব্যাপার। একটা পুকুর, কিছু বুনো ঝোপ বা আগাছায় জঙ্গলে পরিণত হওয়া বাগান। তিনি অনেক দিন থাকতেন শিয়ালদার ওপারে, তখনও ঐ সব অঞ্চলে কিছু কিছু সবুজের অস্তিত্ব ছিল, পুকুর, ডোবা, ঝোপঝাড় দেখা যেত। কলকাতা থেকে তিনি ফেরার সময়ে ট্রামে-বাসে না চড়ে পায়ে হেঁটে যাওয়াই পছন্দ করতেন। কলকাতায় ব্যস্ত মানুষ, যন্ত্রের শব্দময় জীবন দেখতে দেখতে তিনি চলে যেতেন অন্যদিকের নিরালায়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তাঁর বিখ্যাত ছোট গল্পগুলিতে এই সব ব্যাপার মিলে-মিশে আছে।

তাঁর সমস্ত গল্প উপন্যাসেই নারীর রূপ বর্ণনার সময় সব সময় এসে গেছে প্রকৃতির কথা। যেমন তাঁর চোখে নারী ও প্রকৃতি সমান। এ কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের নারী ও প্রকৃতি নয়, এর মধ্যে কোনো তত্ত্ব কথা নেই, এর মধ্যে আছে রূপদর্শন। তিনি প্রকৃতির বন্দনাকারী নন। তাঁর লেখা পড়লেই বোঝা যায়, সৌন্দর্য কোনো বস্তু বিশেষে নেই, তা শুধু আছে দেখার চোখে।

যেমন উদাহরণ হিসেবে গিরগিটি গল্পটি বলা যায়। এই গল্পের বৃদ্ধটি দেখে ভাড়াটে বাড়ির বৌটির স্নানের দৃশ্য। বুড়োটির মনে যৌন-বাসনা নেই। সে দেখে এক উদ্ভাসিত রূপের প্রকাশ। এক নব-যুবতী অনেকখানি নিরাবরণ হয়ে স্নান করছে কুয়োর ঠাণ্ডা জলে, তার একাকীত্ব ও তার রূপ যেন সাবানের ফেনা ও গায়ের চামড়ার মতন মিলে-মিশে আছে। মেয়েটি প্রকৃতপক্ষে কতটা সুন্দরী তা আমরা জানি না, কিন্তু সেই বৃদ্ধটির চোখ তাকে সুন্দরীতমা করে তোলে। মেয়েটিও দেখে, সে দেখে

নির্জনতার মধ্যে কুয়োতলার শ্যাওলায় পড়েছে রোদ, কচু গাছে উড়ে এসে বসে প্রজাপতি, জলের চিক্কণ ধারা, একটি গিরগিটি, সব মিলিয়ে একটা নির্মাণ। বস্তুত বৃদ্ধ ও মেয়েটি একই রূপ দেখছে, যাকে গালভরা কথায় বলা যায়, নিখিল বিশ্বের রূপ, বুড়ো ও নগ্ন মেয়েটিও ওতপ্রোত-ভাবে যার অন্তর্গত।

বিশুদ্ধ সৌন্দর্য দর্শকের এমন দুঃসাহসী গল্প বাংলা কেন যে কোনো ভাষাতেই ক্বচিৎ লেখা হয়।

এক সময় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রচনা সম্পর্কে অশ্লীলতার অপবাদ উঠেছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস সূর্যমুখী থেকে শুরু করে প্রায় সব উপন্যাসই, এবং ছোট গল্পের মধ্যে ছিদ্র, সোনার চাঁদ এমনকি গিরগিটিটি সম্পর্কেও অনেকে এই অভিযোগ এনেছে। এ বড় আশ্চর্য কথা। তাঁর গল্পে তথাকথিত অশ্লীলতা একেবারেই নেই, কারণ তিনি কখনো সম্ভোগ কিংবা যৌন উল্লাসের কথা লেখেন না, তাঁর সমস্ত বর্ণনাই সৌন্দর্য চেতনার। এবং সামগ্রিক বর্ণনা না হলে সৌন্দর্য মূল্যহীন। তিনি একটা কাঁটা গাছ বা কাঠপিঁপড়ের ঝাঁক বা একটা ল্যাম্পপোস্টের কথা লিখতে গিয়েও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তাদের সম্পূর্ণতা ফুটিয়ে তোলেন, যে কোনো গল্পে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এবং তারা পৃথক থেকেও মানুষের মনের ভেতরকার কাঁটা গাছ বা কাঠপিঁপড়ের ঝাঁক বা ল্যাম্প-পোস্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সুতরাং তিনি নারী পুরুষের শরীরকেও কখনো অসম্পূর্ণ রাখেন না। শরীরের রূপকে যিনি সীমাহীন জায়গায় নিয়ে যেতে চান সেই রকম লেখকের বর্ণনার মাঝখানে কোনো সীমারেখা টানার কথা কল্পনাও করা যায় না।

ছোট গল্পের জন্যই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বেশী প্রসিদ্ধ। চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বাংলা ছোট গল্পে একটা স্বর্ণযুগ চলছিল। সেই সময় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি ছোট গল্পে পাঠকদের বিস্ময়বোধ বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর 'শালিক কি চড়ুই'-এর মতন গল্প-গ্রন্থ বাংলা ভাষায় চিরকালের মতন স্থান পাওয়ার যোগ্য।

তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'বারো ঘর এক উঠোন' সবচেয়ে বেশী

প্রসিদ্ধ। নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের এরকম ছবি গড়তে বোধকরি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ পারেননি। আমার সবচেয়ে প্রিয় তাঁর 'মীরার দুপুর'। এতে অবশ্য কোনো বাস্তববাদী ছবি নেই, বস্তুত উপন্যাসটিতে কাহিনীর অংশ অতি সামান্য, কিন্তু যে তীব্র আবেশ ফুটে উঠেছে এর মধ্যে, ভাষা ব্যবহারের যে অপূর্ব কৃতিত্ব, তা কিছুতে ভুলতে পারি না। 'প্রেমের চেয়ে বড়' এবং 'এই তার পুরস্কার' বাঙালী পাঠকদের, যারা শুধু মর্ম-সন্ধানী তাদের জন্য গভীর উপলব্ধির উপহার। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আনন্দ পুরস্কার ছাড়া আর কোনো পুরস্কারই পাননি।

এবারে দু' একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। তাঁর রচনা ও সাহিত্যকীর্তি নিয়ে নিশ্চয়ই উপযুক্ত বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ যথাসময়ে আলোচনা করবেন। তাঁর বিচ্ছেদ সময়ে কিছু স্মৃতিচারণের ইচ্ছে হয়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল অনেকদিন আগে। একটি ছোট দৈনিক সংবাদপত্র অফিসে সে সময় তিনি চাকরি করতেন, আমিও তখন সেখানে রবিবাসরীয় সম্পাদক হিসেবে পার্টটাইম কাজ নিয়েছিলুম। তখন আমি শুধু কবিতা লিখি, কফি হাউসের আড্ডার বাইরে আমাকে কেউ লেখক বলে চেনেই না। একই অফিসে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে কাজ করবো জেনে আমার মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ছিল। তাঁর প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা, তাঁর প্রতিটি রচনার আমি মুগ্ধ পাঠক, কিন্তু আমার মতন একজন অকিঞ্চিৎকর ছোকরাকে তিনি হয়তো পাত্তাই দেবেন না। তাঁকে আমি জানাতেও পারবো না যে আমি তাঁর কতখানি অনুরাগী।

একদিন নিজেই তিনি বিড়ি ধরাবার জন্য দেশলাই চাইতে এসে আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। মজলিশী বা আড্ডাবাজ মানুষ না হলেও অন্তরঙ্গ পরিবেশে বেশ কথা বলতে পারতেন। তবে কিছুক্ষণ কথা বললেই বোঝা যায়, ইনি আর পাঁচজন মানুষের মতন নন। আগাগোড়া পারম্পর্য রেখে সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলা তাঁর ধাতে নেই, তাঁর বাক্য-গুলো ছেঁড়া ছেঁড়া, এক একটা শব্দের ওপর অত্যন্ত বেশী জোর দেন

মাঝে মাঝে, যখন-তখন হেসে ওঠেন। সত্যিকারের ইনট্রোভার্ট ধরনের মানুষ। চশমার পাওয়ার খুব বেশী বলেই হয়তো তাঁর দৃষ্টি খুব গাঢ় ও মর্মভেদী বলে মনে হয়। এবং অবান্তর বা ছেঁদো কথা বলার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল না, তবে এক হিসেবে প্রায় সাহেবদের মতন তিনি আব-হাওয়ার প্রসঙ্গ একবার না একবার তুলতেনই। অর্থাৎ আজকের রোদ বেশী তেজী না নরম, আকাশ আজ মেঘলা না নীল এটা তিনি দেখতেন। সাহিত্যঘটিত এবং জীবনযাপনের যে-সব ব্যাপার সাহিত্যের সঙ্গেই জড়িয়ে যায়, সেই সম্পর্কেই কথা বলতে ভালোবাসতেন।

তবে তাঁর মুখে অপর কোনো লেখকের নিন্দা শুনিনি কখনো, সাহিত্যের বাজারের ওঠাপড়া নিয়ে লোকে কথা বলতেন না, পুরস্কার-টুরস্কার নিয়ে কক্ষণো মাথা ঘামাননি। শুধু তাঁর লেখা কখনো সে রকম জনপ্রিয় হলো না বলে তাঁর মনে একটু ক্ষোভ ছিল, যদিও এ ব্যাপারটাও তিনি উল্লেখ করতেন হাসতে হাসতে। এরকম সময়ে তিনি নিজেকে শালা বলে সম্বোধন করতেন, বলতেন, আমার শালা কিছু হলো না! তার একটু পরেই কিন্তু তিনি নিজের নতুন কোনো লেখার কথা সবিস্তারে বলতেন, অর্থাৎ লেখার আনন্দেই মশগুল হয়ে থাকতেন।

তাঁর সঙ্গে কিছু অন্তরঙ্গতা হবার পরও একটা বিস্ময়বোধ আমার ছিলই। মানুষ হিসেবে তাঁকে মনে হতো খুবই সরল ও অনেকটা শিশুর মতন, অথচ ইনিই মানুষের মনের অতি জটিল কামনা-বাসনা হিংসার কথা লেখেন কী করে ভেবে অবাক হয়ে যেতুম।

আরও দুটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। সাধারণত একটা বয়সের পর লেখকদের মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তির ভাব আসে। যা লিখেছি যথেষ্ট লিখেছি কিংবা আমি যা লিখি তার কোনোটাই খারাপ হতে পারে না এরকম আত্মশ্লাঘার ভাব প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। আমার সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ, তখন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পরিণতবয়স্ক এবং অনেকগুলি দারুণ লেখা লিখেছেন, অথচ সে সময়েও তাঁর অনবরত চিন্তা ছিল কী করে লেখা আরও ভালো করা যায়। এজন্য তাঁর কৌতূহল ছিল সদাজাগ্রত, নতুন ছেলেমেয়েরা কী ভাবে তা

জানার চেষ্টা করতেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আধুনিক সাহিত্য কী রকম হচ্ছে তা জানার জন্য নিয়মিত বিদেশী বই পড়তেন। এমনকি আমার মতন মূর্খকেও তিনি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন, ইংরেজিতে নতুন কোন্ কোন্ লেখকের বই পড়া যায় বলো তো ?

বাংলা ভাষাতেও তিনি তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠদের লেখা পড়তেন মন দিয়ে। সাহিত্য যে একটা সচল ব্যাপার, নতুন কালের লেখকরা যে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় এই ধারণা তাঁর খুব পরিষ্কার ছিল এবং সেই গতির স্পন্দন তিনি বোঝবার চেষ্টা করতেন খুব মনোযোগ দিয়ে।

সেই ছোট সংবাদপত্রের চাকরিতে আমরা দু'জনেই বেশীদিন থাকিনি। কিন্তু তার পরেও তাঁর সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, এবং দেখা হলেই তাঁকে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতন মনে হতো।

সাগরময় ঘোষ ওঁর যৌবন-সুহৃদ, ওঁদের দু'জনের একটা স্থায়ী অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, প্রত্যেক বছর অষ্টমী পূজোর সন্ধ্যেবেলা দু'জনের দেখা হবেই। সেদিন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজের শরীরকে ও মনকে কিছুটা অতিরিক্ত পান-ভোজনে প্রশ্রয় দিতেন। শেষের দিকে কয়েকবার আমরাও জুটে যেতুম সেই আড্ডায়।

১৩৭৬ সালের দেশ-এর সাহিত্য সংখ্যায় আমি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তাতে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ ছিল, এখানে তার কিছু কিছু আবার বলতে চাই। তাঁর মুখে তাঁর কোনো ভবিষ্যৎ গল্পের বর্ণনা শোনা ছিল একটা অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা। অনেকটা এই রকম···তারপর বুঝলে, দু' বন্ধু গেল পুরীতে···একটা বাসা ভাড়া করে রইলো, বুঝলে, রাত্রে মেয়েটা বুঝলে, তারপর মেয়েটা তো খুন হয়ে গেল, বুঝলে, তখন পাশের ঝাউ বনে সাঁ সাঁ করে হাওয়া দিচ্ছে, সাঁ সাঁ করে হাওয়া দিচ্ছে, বালির মধ্যে ঝাউগাছগুলোর পাতায়।

মেয়েটার খুন হওয়ার ব্যাপারে তিনি সামান্য গুরুত্বও দিলেন না, কিন্তু পাশের ঝাউবনের সাঁ সাঁ ঝড়ের বর্ণনায় তাঁর অদ্ভুত উত্তেজনা দেখা গেল, উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে তিনি ঝড়ের আন্দোলন বোঝাতে লাগলেন। তাঁর চোখ মুখ তখন একেবারে পাল্টে গেছে, যেন তিনিই

সেই ঝড়ের মধ্যে পড়েছেন।

আর একদিন তিনি খুব চিন্তিত মুখে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার একটা গল্পের বই বেরুবে, কী নাম দেওয়া যায় বলো তো ? 'সমুদ্র' না 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা' ? এ রকম অদ্ভুত অল্টারনেটিভ আমি আগে কখনো শুনিনি।

সেই ছোট সংবাদপত্র অফিসে কমলকুমার মাঝে মাঝে আসতেন আমার কাছে, হয়তো আমার মাধ্যমেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তু'জনের লেখা তু'রকমের হলেও কোথাও যেন আমি একটা মিল খুঁজে পেতুম। কিন্তু এক পালকের পাখীরা একই জায়গায় বসবাস করলেও এক জাতের লেখকরা পরস্পরের থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকেন। ওঁদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছিল, ওঁরা কেউই কারুর কোনো লেখা পড়েননি। এবং খুব আন্তরিকভাবে স্বভাব-বিরোধী কথা বলে যাচ্ছেন। যেমন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বললেন, বুঝলেন কমলবাবু, লেখার জন্য অনেক অভিজ্ঞতা দরকার, অনেক দেশ ও মানুষ দেখা দরকার, বুঝলেন, অনেক জায়গায় যাওয়া দরকার, বুঝলেন, এমনি এমনি কি হয় ? কমলকুমার মজুমদার গম্ভীরভাবে বললেন, আমার কিন্তু তা মনে হয় না, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু, অভিজ্ঞতার জন্য তো ঘোরাঘুরির কোনো দরকার নেই। সমস্ত অভিজ্ঞতাই পাওয়া যায় গ্রন্থের মধ্যে. মানুষের মনীষার যা কিছু সবই তো গ্রন্থের মধ্যে আছে, অভিজ্ঞতার জন্য বাইরে তাকাবার কোনো মানে হয় না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কমলকুমার সেই সময় ছিলেন ডাকাবুকো ধাতের অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষ, আর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ঘর-কুনো, একাচোরা ধরনের।

আমাদের সেই কার্যালয়ের উল্টোদিকে একটি নতুন চায়ের দোকান খুললো, সেখানে পরিবেশনকারিণী তিন চারটি মেয়ে। কলকাতায় তখন এই রকম একটি হুজুগ উঠেছিল। অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে আমার এই ঘটনাটা মনে পড়লো। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আমায় একদিন বললেন, তোমায় একটা টাকা দিচ্ছি, তুমি ঐ দোকানে গিয়ে চা আর কাটলেট

খেয়ে একটু দেখে এসো তো, মেয়েগুলো কি করে? আমি সরলভাবে বললুম, আপনিও চলুন না। উনি প্রায় কুঁকড়ে গিয়ে বললেন, না, না, আমার চা সহ্য হয় না। বাইরের খাবার খাই না। তাছাড়া ঐ সব মেয়ে-টেয়ে, বুঝলে, তোমার কম বয়েস, তুমি বরং, বুঝলে ··।

সেই চায়ের দোকানে শেষ পর্যন্ত জ্যোতিদা বা আমি কেউই যাইনি, দোকানটিও অবিলম্বে উঠে যায়। কিন্তু চায়ের দোকান নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অবিস্মরণীয় গল্প লিখেছেন তার কিছু পরেই।

বিদায়, জ্যোতিদা। আবার দেখা হবে!

## নাইরোবির গুরুদ্বারে মারাঠি দুর্গা

লণ্ডন ছাড়ার আগে বন্ধুরা বললো, আর দু'চারটে দিন থেকে যাও না, এখানকার পূজোটা দেখে যাবে। কিন্তু আমায় তখন আফ্রিকা টানছে। দুর্গা ঠাকুর কিংবা দুর্গোৎসবের চেয়ে আফ্রিকার টান আমার কাছে অনেক বেশি। এর আগে আমি মিশরে গিয়েছিলুম একবার, কিন্তু সেটা নামেই শুধু আফ্রিকা মহাদেশ, এখনকার মিশর একটি আরব দেশ। কালো মানুষ ও সিংহের দেশ প্রকৃত আফ্রিকায় এই আমার প্রথম পদার্পণ।

এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানের যাত্রীরা অনেকেই প্রবাসী ভারতীয়, বাঙালির সংখ্যাও যথেষ্ট, তারা পূজো দেখতে দেশে আসছে। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হলো, আমি লণ্ডন থেকে সোজা দেশে না ফিরে মাঝপথে নেমে পড়বো শুনে তারা অনেকেই অবাক। একসময় আমরা যেমন কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে পূজো দেখতে যেতাম, সেইরকম এইসব প্রবাসীরা বিলিতি কাপড় জামা নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম বাংলার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য।

কেনিয়ায় ঠিক কত বাঙালি আছে, সে সম্পর্কে আমার ঠিক ধারণা ছিল না। আমার ওঠবার কথা তন্ময় দত্তের বাড়িতে। চাকরি বদল করার ব্যাপারে তার বিশ্ব রেকর্ড করার বিশেষ দেরি নেই বোধহয়। সে

যে কখন কোন্ দেশে থাকে, তা ধরা মুশকিল। দৈবাৎ নাইরোবি শহরে তার অবস্থানের খবর পেয়েই আমি আর এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি, তার বাড়িতে আতিথ্য নেবার প্রস্তাব পেয়েই আমি প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছি। বিমানবন্দরে আমাকে অবাক করে দিয়ে দু'হাত মেলে অভ্যর্থনা জানালো আমার আর এক বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধু অমল লাহিড়ী, সে ছিল নাইজিরিয়ার লাগোস শহরে, মাত্র কয়েকদিন আগে সপরিবারে এসেছে নাইরোবিতে। আড্ডা গুলজার হবার সম্ভাবনায় আমি উৎফুল্ল হলুম।

নাইরোবি শহরটি আধা বিলিতি ধাঁচের, প্রশস্ত রাস্তাঘাট বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল, গাড়িগুলি জাপানী ও মার্কিন, বাড়িগুলি আধুনিক স্থাপত্যরীতির, কিন্তু মানুষগুলো কালো ও খয়েরি রঙের। দোকানপাটের সংখ্যা অনেক, অধিকাংশ দোকানেরই মালিক-কর্মচারী গুজরাতি বা সর্দারজি। শহরের একদিকে লম্বা-টানা দেওয়াল, তার ওপাশে সংরক্ষিত অরণ্য। যে-হেতু শহরের আয়তনের তুলনায় অরণ্যটি সুবিশাল, তাই একথা বলা যেতে পারে যে শহরের মানুষগুলোকেই দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, অরণ্যের প্রাণীরা সব স্বাধীন।

নাইরোবি শহরে এসে প্রথম দিনেই সিংহ দর্শনের কথা গাঁজাখুরি মনে হতে পারে, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাই ঘটে গেল। দু'একটা সিংহ নাকি মাঝে মাঝে ছিটকে ছাটকে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, একবার বিমানবন্দরেও এক সিংহ দম্পতি এসে আস্তানা গেড়ে দু'তিন দিন বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি অবশ্য সেসব দেখিনি, তবে প্রথম দেখার দিনই বিকেলে অমল আর মঞ্জুর সঙ্গে গাড়ি নিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করার খানিক পরেই দেখা গেল একটা হরিণের পাল এবং পাশের ঘাসঝোপ থেকে হলুদ বজ্রের মতন লাফ দিয়ে এসে পড়লো একটি সিংহীনী। আমাদের চোখের সামনে সে নির্লজ্জভাবে মড়মড় করে হরিণের হাড় চিবোতে লাগলো।

প্রথম দিনেই সিংহ ছাড়া আর একটি ব্যাপার দেখে আমি বিস্ময়-মুগ্ধ হয়েছিলুম। তন্ময়ের অ্যাপার্টমেন্টটি বেশ শৌখিন পাড়ায়, অত্যাধুনিক

এক গৃহ-গুচ্ছের মধ্যে। এই গৃহ-গুচ্ছটির মালিকানী কেনিয়ার প্রয়াত জাতীয় নেতা জেমো কেনিয়াট্টার অনেক পত্নীর মধ্যে একজন। সেখানে লোক এলো বাথরুম পরিষ্কার করতে। তাকে দেখে আমি চমৎকৃত। বার্নিস করা কালো রঙের সে এক স্বাস্থ্যবান যুবা, প্যান্ট শার্ট ও জুতো-মোজা পরা, সে গুনগুন করে গান গাইছিল। আমি জুতো-মেজা পরা, সঙ্গীতরসিক জমাদার কলকাতা শহরে এ পর্যন্ত দেখিনি, ভারতের অন্য কোনও শহরে আছে বলেও শুনিনি।

তন্ময়ের বাড়ির চেয়ে অমল-মঞ্জুর বাড়িতেই আড্ডা জমে বেশি। তন্ময় লাজুক ও একাচোরা স্বভাবের, কাজের সময়ের পরে সে বইতে ও রেকর্ড সঙ্গীতে ডুবে থাকতে ভালোবাসে। অমল-মঞ্জু যেখানেই যায়, সেখানেই হইচই করে জমিয়ে তোলে, ওদের ব্যক্তিত্বের টানে অনেকেই আসে। ওদের অ্যাপার্টমেন্টটা শহরের কেন্দ্রস্থলে, বাজার করার জন্যও সেখানে অনেককে আসতে হয়। সে বাড়িতে গিয়ে শুনি দুর্গা পূজোর প্রস্তুতির মিটিং শুরু হয়ে গেছে।

নাইরোবি শহরে সাতষট্টিটি বাঙালি পরিবার। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা মিলেমিশে বেশ কিছু অনুষ্ঠান করেন, তবে দুর্গা পূজোর ব্যাপারে বাংলাদেশিরা দূরে থাকেন সংগত কারণেই। কেনিয়ার অন্যান্য শহর থেকেও এই উপলক্ষে অনেক বাঙালি এসে পড়েন নাইরোবিতে।

আমেরিকায় দু'একটি শহরে বাঙালিদের দুর্গা পুজো আমি দেখেছি এর আগে। সেখানে পূজো হয় শুধু শনিবার। যে-বছর পূজোর তারিখ যাই-ই পড়ুক, মার্কিন বাঙালিরা তার কাছাকাছি শনিবারটাই বেছে নেন। ক্লিভল্যাণ্ড শহরে একই দিনে পরপর চার ঘণ্টায় সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী-বিজয়া সাঙ্গ হয়ে গেল, তারপর খাওয়াদাওয়া।

সেই তুলনায় নাইরোবির বাঙালিরা যথেষ্ট নিষ্ঠাবান। তাঁরা চারদিন ধরেই পূজো করবেন। কয়েকজন ছুটির দরখাস্ত করে ফেলেছেন। শুভঙ্কর নামে একটি যুবকের দেখলুম দারুণ উৎসাহ, একজন শিক্ষক চট্টোপাধ্যায় বামুন, তিনি হবেন পুরোহিত। মেয়েরা কবে কে কী রান্নার ভার নেবেন তাও ঠিক হয়ে গেল। প্রতিটি পরিবারের চাঁদা চারশো শিলিং ( এক

কেনিয়ান শিলিং বারো আনার মতন )।

পূজো হবে কোথায় ? রাস্তায় প্যাণ্ডেল বাঁধার নিয়ম নেই। শিখদের একটি গুরুদ্বার পাওয়া যাবে বিনা ভাড়ায়, এদেশে শিখ-হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চমৎকার সহযোগিতা আছে। বিদেশে পাকিস্তানিরাও ভারতীদের খুব বন্ধু হয়, এমন দেখেছি। সব ব্যবস্থা পাকা হবার পর প্রশ্ন উঠলো, প্রতিমার কী হবে ? কলকাতা থেকে আনাবার সময় নেই, খরচও অনেক। নাইরোবিতে প্রতিমা তৈরি করার মতন কেউ নেই, তবে একজন মারাঠি ইঞ্জিনিয়ার আছেন, যিনি ছবি আঁকতে পারেন। তাঁকে অনুরোধ করে ক্যানভাসে আঁকানো হলো ছোট মাপের ছবি, তাতে দুর্গার শাড়ি পরার ধরন দেখে মনে হয় মারাঠি মহিলা ! তাতে কোনও দোষ নেই, দুর্গা ঠাকুরকে বাঙালি হতে হবে, এমন কোনও কথা আছে কী ?

পূজোয় যোগদানের জন্য আমিও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলুম। গুরুদ্বারে মারাঠি মহিলার মতন দুর্গার পূজো যেমন জমে তা দেখার কৌতূহল আমার ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সুযোগ আমার হলো না। তার আগেই বিশ্ববিখ্যাত সেরিংগেটি জঙ্গলে সফরের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল, নাইরোবি শহরের পূজো ছেড়ে আমার সঙ্গে বন্ধুরা কেউ যেতে পারবে না, আমাকে যেতে হলো একা।

ছোট প্লেনে করে যেখানে গিয়ে নামবার কথা, সেই এয়ার স্ট্রিপে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের মতন চেহারার তিনটি হাতি। প্লেনটা চক্কর দিতে লাগলো আকাশে, নীচে বন-কর্মীরা বোমা ফাটিয়ে তাড়াতে লাগলো সেই হাতিদের. আমরা উৎসুকভাবে তাকিয়ে রইলুম প্লেনের জানলায়। সেই বোমার আওয়াজেও দাঁতালো হাতিরা ভয় পায় না, কিন্তু দেখা হলো হাজার হাজার জেব্রা ছুটে পালাচ্ছে।

যাই হোক, নামা হলো একসময়। এই অঞ্চলটির নাম মাসাইমারা, জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুর হোটেল। একা আসার জন্য আমার একটুও খারাপ লাগে না, একা থাকলে অপরিচিতদের সঙ্গে কম কথা বললেও চলে, একেবারে মুখ বুজে থাকলে অরণ্যের নিস্তব্ধতাও শুষে নেওয়া যায় শরীরে।

দিন তিনেক সেই জঙ্গলে থাকবার পর, এক বিকেলে, তাঁবুর সামনে বসে বসে হরিণ ও জিরাফের পালের আনাগোনা দেখছি, একটা জলার পাশে চরছে গোটা দশেক বাইসন, এমন সময় হঠাৎ ঢাকের বাজনার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলুম। মনে মনে হিসেব আছে, আজই বিজয়ার দিন। এ যেন বাংলার বিসর্জনের ঢাকের আওয়াজ! এই জঙ্গলেও দুর্গা পুজো হয় নাকি?

পরে মনে পড়লো, এই জঙ্গলেই মাসাইদের একটা গ্রাম দেখেছি। আজ বোধহয় তাদের কোনো পরব আছে।

## আমি যখন…তুমি

আমি যখন কলকাতার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই, তখন গাড়িওয়ালা লোকদের ওপর আমার খুব রাগ হয়। কলকাতার রাস্তায় এত লোক যে ভালোভাবে হাঁটাই যায় না। এই বর্ষার সময় যেখানে সেখানে জল কাদা জমে থাকে, তারই মধ্যে গাড়িগুলো এমন বেপরোয়া ভাবে যায় যে সব সময় প্রাণটা হাতে নিয়ে থাকতে হয়। গাড়ির চাকায় ছেটকানো জল কাদা আমাদের গায়ে লাগে, কিন্তু গাড়ির ড্রাইভাররা তা গ্রাহ্যও করে না। অথচ, রাস্তাগুলো তো আসলে পদাতিকদের জন্যই!

আবার আমিই যখন গাড়ি চড়ে যাই, তখন মনে হয় কলকাতা শহরের রাস্তার লোকগুলো অতি অদ্ভুত। এরা কোনো রকম শহুরে নিয়মকানুন মানে না। ফুটপাথ ছেড়ে এরা যখন তখন রাস্তার মাঝখানে চলে আসে, এর মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালানো যে কত অসুবিধে তা এরা বুঝবে না। প্রায়ই দু'তিন বন্ধু রাস্তার মাঝখান দিয়ে গল্প করতে করতে যাচ্ছে, পেছনে গাড়ির হর্ণ শুনলে একবার ফিরেও তাকায় না। হঠাৎ হঠাৎ এক একজন লোক ট্রাফিক কনস্টেবলের মতন হাত তুলে চলন্ত গাড়ি থামিয়ে দেয় নিজে রাস্তা পার হবার জন্য! অন্য যে কোনো দেশ হলে এইসব লোককে অ্যারেস্ট করা হোতো। যে সব লোক রাস্তা দিয়ে

ঠিকমত হাঁটতে পারে না, তাদের শহর থেকে বার করে দেওয়া উচিত !!

একবার দুর্গাপুর স্টেশনে এসে দেখি আমার ট্রেনটা সত্য ছেড়ে দিয়েছে। পরের ট্রেন অনেক পরে, সেইজন্য আমি মরীয়া হয়ে ছুটতে ছুটতে চলন্ত ট্রেনেই উঠে পড়লুম। কামরাটার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, আমি দুম্ দুম্ করে ধাক্কা দিয়ে ভেতরের যাত্রীদের বলতে লাগলুম, খুলে দিন! খুলে দিন! ভেতর থেকে একসঙ্গে তিন-চার-জন বললেন, জায়গা নেই, জায়গা নেই।

যে-হেতু আমি কখনো চিনেবাদাম বিক্রি করিনি কিংবা গান গেয়ে ভিক্ষে করিনি,-সেইজন্য চলন্ত ট্রেনে ঝুলে ঝুলে যাওয়ার অভ্যেস আমার নেই। আমার রীতিমতন ভয় করছিল, যে-কোনো মুহূর্তে ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা লেগে মাথাটা ফেটে যাবে এই আশঙ্কা হচ্ছিল। ভেতরের লোকগুলো কি স্বার্থপর! আমি কাতরভাবে অনুরোধ করতে লাগলুম, দাদা, খুলে দিন, দয়া করে খুলে দিন, আমি পড়ে যাচ্ছি!

একটু পরে দরজাটা কেউ একটু ফাঁক করলো, আমি কোনো রকমে বাঁদরের মতন শরীরটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকে পড়লুম ভেতরে। এই ভাবে চলন্ত ট্রেনে ওঠার জন্য অনেক লোকই বকুনি ও উপদেশ দিতে লাগলো আমাকে। আমি চুপ করে সব মেনে নিলুম। ভেতরে সত্যিই খুব ভিড়, দাঁড়াবারও জায়গা নেই। অধিকাংশ ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা যে-রকম হয়।

পরের স্টেশনে কোনো লোককে সেই কামরায় উঠতে দেওয়া হলো না। কিন্তু ট্রেন চলতে শুরু করার পরই একাধিক লোক বন্ধ দরজায় দুম্ দুম্ করে ধাক্কা দিয়ে অনুরোধ করতে লাগলো, দাদা, খুলে দিন, খুলে দিন! ভেতরের লোকেরা ধমকে বলতে লাগলেন, জায়গা নেই, জায়গা নেই!

আমি চুপ করে রইলুম। এই লোকগুলোকে দরজা খুলে দিতে বলার সাহস আমার নেই। তাছাড়া আমি এখন ভেতরের লোক হয়ে গেছি, আমার মানসিকতাও যেন সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে। এখন আমার মনে হচ্ছে, এর মধ্যে আবার দু'জন বাইরের লোকের জায়গা কী করে

হবে ? আমি চুপ কার থাকি, বাইরের দু'জন লোক অবিরাম দরজায় ধাক্কা দিয়ে চলে !!

অফিসে আমার ঘরে প্রায়ই খুব ভিড় হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই কাজের কথা সংক্ষেপে সেরে নিতে জানে না। আবার অনেক লোক জানেই না, তারা সঠিক কী চায়, সেইজন্য তারা শুধু ভূমিকাই করে চলে, আসল কাজের কথা আর বলেই না, সেইজন্য মাথা ঠাণ্ডা রাখা এক এক সময় খুব শক্ত হয়। একদিন আমার টেবিলের সামনে এই রকম তিন-চারজন ভিজিটর রয়েছে, এরই মধ্যে নিচ থেকে আমাদের রিসেপশনিস্ট ফোন করে জানালেন, একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, নাম বলছে না, বলছে, আপনার সঙ্গে চেনা আছে।

আমি বিরক্ত ভাবে বললুম, অপেক্ষা করতে বলুন। খালি হলে আমি ডাকবো!

এরপর দু'ঘণ্টা কেটে গেছে। আমি কাজে ব্যস্ত ছিলুম, সেই লোকটির কথা আর আমার মনেই পড়েনি। হঠাৎ খেয়াল হতেই রিসেপশনিস্টকে ফোন করলুম। সে বললো, সেই ভদ্রলোক তো প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে চলে গেছেন! আপনি ডাকেননি। ভদ্রলোক কিছু না বলেই চলে গেলেন।

সামান্য অনুতপ্ত হলুম। কে ছিল লোকটি ? সে বলেছিল আমার চেনা, কিন্তু নাম জানায়নি কেন ? সে বোধহয় রাগ করে চলে গেছে। আমার যে ঘরভর্তি লোক ছিল, তা কি সে বুঝবে ? অনেক লোক এসে একসঙ্গে বিরক্ত করলে মাথার ঠিক রাখা যায় ? একটু পরেই অবশ্য ভুলে গেলুম লোকটির কথা।

হঠাৎ একদিন আমায় বিশেষ জরুরি কাজে পাসপোর্ট অফিসে যেতে হয়। দু'দিন বাদেই আমাকে বিদেশে যেতে হবে, শেষ মুহূর্তে আমি আবিষ্কার করেছি যে আমার পাসপোর্টের বয়েস পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে, সেটা রিনিউ না করালে যেতে পারবো না। ব্যাপারটা অতি সামান্য, একটা রাবার স্ট্যাম্পের ছাপ দেওয়া শুধু।

কিন্তু পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে দেখি সেখানে বিরাট ভিড়, মস্তবড় লাইন, হুলুস্থুলু ব্যাপার। এই লাইনে দাঁড়ালে আমার সারাদিন কেটে যাবে, এতটা সময় দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

ঐ অফিসের একজন অফিসারের সঙ্গে আমার কিছুটা চেনাশুনো আছে, দেখা করতে চাইলুম তার সঙ্গে, কিন্তু ভিতরের মহলের দরজায় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, সে আমায় ভেতরে যেতে দেবে না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কোনো অফিসারের সঙ্গে দেখা করা যায় না। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবো কী করে? আসবার আগে আমি অন্তত পনেরো বার টেলিফোনে সেই অফিসারটিকে ধরবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কলকাতা শহরে সবচেয়ে দরকারের সময়েই তো টেলিফোনগুলো মৃত হয়ে যায়। পাসপোর্ট অফিসের ফোন একবারও বাজে নি। দ্বাররক্ষীটিকে আমার জরুরী দরকারের কথা বোঝাতে গেলুম, সে পুরোটা না শুনেই বললো, পাসপোর্ট জমা দিয়ে যান, সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না।

তখন আমি একটা শ্লিপ লিখে খুব কড়া গলায় তাকে বললুম, তোমার সাহেবকে এটা দেখাও, তিনি আমায় চিনতে পারবেন।

আমার মুখের ওপরেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে চলে গেল। এবং একটু বাদেই ফিরে এসে বললো, সাহেব বলেছেন, আজ দেখা হবে না, পরে আসবেন!

আমি এমনই অপমানিত বোধ করলুম যে আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো, মনে হলো, সেই মুহূর্তে আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো। এরকম আমার হয়, কেউ অপ্রত্যাশিতভাবে অপমান করলে আমি চোখে অন্ধকার দেখি। দেয়াল ধরে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিলুম। অফিসারটি আমার নাম দেখেও চিনতে পারলো না? তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে, তাও সে একবার ডাকলো না আমাকে?

এমনও হতে পারে অবশ্য যে বেয়ারাটি আমার শ্লিপটা দেখায়নি অফিসারটিকে। এমনিই ফিরে এসেছে। কিন্তু এর সঙ্গে তো ঝগড়া বা মারামারি করে কোন লাভ নেই? এখন আমি কী করবো?

সৌভাগ্যবশতঃ পাসপোর্ট অফিসের একজন মহিলা অফিসার সেদিন

আমায় দেখে চিনতে পেরেছিলেন এবং অনেক সাহায্য করেছিলেন।

কাজ সেরে বেরিয়ে আসবার পর আমার মনে পড়লো সেই লোকটির কথা, আমার অফিসে যাকে আমি নিচে বসিয়ে রেখেছিলাম, পরে তাকে ডাকতেই ভুলে গেছি। সে কী ভেবেছিল আমার সম্পর্কে ?

## প্রেম, ভালোবাসা নয়

আমরা অনেকে মনে করি, বাচ্চারা সবাই খুব সরল আর নিষ্পাপ।

আসলে আমরা নিজেদের শৈশবের অনেক ঘটনা ভুলে যাই কিংবা ভুলে যেতে চাই। বাচ্চারা সরল হতে পারে, কিন্তু নিষ্পাপ মোটেও না, এবং বেশ নিষ্ঠুর। শিশুরা একটা সুন্দর প্রজাপতির ডানা ছিঁড়ে ফেলতে পারে অনায়াসে। পাখির গলা টিপে ধরে। কুকুরের ল্যাজে জ্বলন্ত ফুলঝুরি বেঁধে দেয়।

যে-কোনো সুন্দর জিনিসকে নষ্ট করতে তাদের একটুও হাত কাঁপে না। নিতান্ত প্রিয়জনের মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো মৃত্যুকে গ্রাহ্যই করে না শিশুরা। বরং অনেক সময় মজা পায়।

আমার এক বন্ধুর মুখে একটা ঘটনা শুনেছিলাম। সে তার সাত বছরের ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিল সাঁতার শেখাতে। প্রথম দিন, সাজ-পোশাক নিয়ে বন্ধুটি ছেলের হাত ধরে গেল বালিগঞ্জ লেকের এক সুইমিং ক্লাবে। সেখানে গিয়েই শোনা গেল এক দুর্ঘটনার খবর। একটি ষোলো-সতেরো বছরের কিশোর ঝাঁপ দিয়েছিল অনেক উঁচু থেকে, সে আগে ঝাঁপ দেবার কায়দা-কানুন শেখেনি, জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নিঃশ্বাস শেষ হয়ে যায়। পেছন দিকের বারান্দায় রয়েছে তার মৃতদেহ। সেদিন তো আর কারুর সাঁতার শেখার প্রশ্নই ওঠে না, শিশু মনে এই ঘটনা যাতে কোনো ছাপ না ফেলে তাই বন্ধুটি ছেলেকে এই আলোচনা শুনতেই দিল না, মৃতদেহের দিকে ওকে নিয়ে গেল না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ছেলের মন ভোলাবার জন্য বললো, আজ জল খারাপ হয়ে

গেছে, আজ সাঁতার শেখা হবে না! পৃথিবীতে কত রকম লেক আছে জানিস? বল তো মিষ্টি জলের হ্রদ কাকে বলে? সেই জল কতটা মিষ্টি? চিনি মেশানো, না গুড় মেশানো? বাড়ি ফেরার পর বন্ধুর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, কি হল? ফিরে এলে এত তাড়াতাড়ি? বন্ধুটি কিছু উত্তর দেবার আগেই ছেলেটি বললো, মা, কী হয়েছে জানো? একটা ছেলে না জলে ডুবে গেছে! এরপর ভূত হবে। জলে ডুবে মরলে ভূত হয় না?

বালক বয়সে আমার নিষ্ঠুরতার কথা কিছু কিছু মনে পড়ে। বেড়াল দেখলেই আমি গায়ে জল ঢেলে দিতাম। ভিজে-বেড়ালের চেহারা দেখে আমার মজা লাগতো। সুন্দর লোমওয়ালা নাদুসনুদুস বেড়ালগুলো জল লাগলেই ছোট্ট হয়ে যেত চুপসে। কোথাও দেয়ালের গায়ে পিঁপড়ের সারি দেখলেই জল ছেটাতাম।

পিঁপড়ের গর্ত খুঁজে ভরে দিতাম জল। অনেক নির্জন দুপুর আমি পিঁপড়ে মারার নেশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতাম। নিশ্চয়ই কয়েক লক্ষ পিঁপড়ে হত্যা করেছি। অন্য কোনো বাচ্চা ছেলেকে কাঁদতে দেখলে কখনো দয়া হতো না, রাগ হতো, ইচ্ছে হতো ওর কান্না থামবার জন্য একটা চড় মারি।

প্রথম একটা ডানা ভাঙা পাখি দেখে আমার মায়া জেগেছিল চোদ্দ-পনেরো বছর বয়েসে। তখনই সবে মাত্র আমি এক বালিকার প্রেমে পড়তে শুরু করেছি। পাখিটার যত্ন-আত্যি করে উড়িয়ে দিয়েছিলাম আকাশে, তাতে অদ্ভুত এক তৃপ্তি হয়েছিল। এবং মনে হয়েছিল, এই ঘটনাটি ওই বালিকাটির প্রতি লেখা প্রেমপত্রে উল্লেখ করার যোগ্য। প্রেমপত্রের বিষয়বস্তু করার জন্যই পাখিটার সেবা করেছিলাম, না পাখিটার সেবা করার পর সেটা প্রেমপত্রে লিখেছিলাম, তা এখন স্পষ্ট মনে নেই। প্রথমটাও সত্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিংবা সেটা কি ছিল প্রেম, না যৌনতার উন্মেষ? সেই বয়সে সদ্য পিউবার্টি এসেছে এবং লিবিডো জেগেছে।

প্রেম তখনও চেনা যায় না, সদ্য জাগা যৌনতার বিস্ময়েই শরীর ছটফট করে। নিজের সমবয়সী মেয়েদের চেয়েও বেশি বয়সের, ভরাট স্বাস্থ্যের

যুবতীদের একটু আড়াল থেকে দেখলেই মোহময় কাম জেগে ওঠে।

এই যৌনতার উন্মেষের পর থেকেই দয়া, মায়া, স্নেহ, সৌন্দর্যবোধ আসে। মানুষের শিশু তখন থেকে পূর্ণ মানুষ হতে শুরু করে।

অনেক দুরন্ত, অবাধ্য ছেলেমেয়ে এই বয়েসে হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। কারুর কারুর গান গাইবার কিংবা ছবি আঁকবার ক্ষমতা বোঝা যায় এই বয়েসে। পড়াশুনোয় যে ছিল সাধারণ, সে হয়ে যায় মেধাবী। কেউ কেউ অবশ্য কখনো স্বাভাবিক, পূর্ণ মানুষ হয় না। তাদের যৌনতা চলে যায় বিকৃত দিকে। বয়েস বাড়লেও তারা হয়ে থাকে নিষ্ঠুর, ক্রূর, দয়া-মায়া-বোধহীন, সৌন্দর্যের ধ্বংসকারী। ঠিক কোন্ বয়েস থেকে যৌনতার উন্মেষ হয় তা বলা শক্ত। ভিয়েনার যুগান্তকারী ডাক্তারটি সেই বয়েসটা কমাতে কমাতে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যে ভাবতেও ভয় হয়। মাতৃস্তন্য পান করিয়ে শিশু, সেও যৌনসুখ অনুভব করে, এ কথা এখনও অবিশ্বাস্য মনে হয়। যাই হোক, সে তো অবচেতনের কথা। সচেতনভাবে যৌন বাসনা জাগে মোটামুটি তের-চোদ্দ বছর বয়েসে। মেয়েদের বোধহয় আর একটু আগে। আমরা এখন বারো-তেরো বছরের ছেলেমেয়েদের বাচ্চা বলে মনে করি। আমরা নিজেরা কিন্তু ঐ বয়সে মোটেই বাচ্চা ছিলাম না। আমি ঐ বয়সে একটু দূর সম্পর্কের যুবতী আত্মীয়াদের সম্পর্কে কী ভাবতাম, তা যদি তাঁরা জানতে পারতেন, নিশ্চিত শিউরে উঠতেন। মনের সেই ছবিটা তোলা গেলে, তা দেখে মা-বাবারা অবিশ্বাসে অজ্ঞান হয়ে যেতেন অবশ্যই। কিন্তু সেই চিন্তাকে অসুস্থ কিংবা পাপ বলে মনে করার মতো কোনো কারণ নেই। আমি সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ হিসেবেই তো বেড়ে উঠেছি। যৌন-সম্পর্ক আর যৌন-বাসনা তো এক নয়। অপরিণত বয়সে, অবৈধ যৌন সম্পর্কে অনেক গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু গোপনে, অত্যন্ত গোপনে, স্বপ্ন দেখার মতন যৌন বাসনা তো কল্পনাশক্তিরই বিস্তার ঘটায়। প্রথমে যৌনতার উন্মেষ, তারপর কাম স্পৃহা, তারপর প্রেম। এসব কোনো তত্ত্বকথা নয়। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করেই বলছি। ছেলেদের পক্ষে যৌন বাসনা যে কোনো যৌবনবতীকে ঘিরেই জাগতে

পারে, ফিল্মের নায়ক-নায়িকাদের সম্পর্কে মোহ, তাদের ছবি ছিঁড়ে রাখা, সে ছবি বারবার দেখা, এ তো যৌন অভিলাসেরই প্রকাশ। এক মাটির তৈরি দেবী মূর্তি দেখে আমার এরকম অভিজ্ঞতা জেগেছিল, এটা একেবারে সত্যি কথা। এটা অস্বাভাবিকও কিছু নয়। পিগ-ম্যালিয়ানের কাহিনীটাও তো তাই। কিন্তু প্রেম হয় শুধু একজনকে ঘিরে। সেই একজন কোনও ছবির মানুষ কিংবা মূর্তি নয়, রক্ত মাংসের।

প্রথম বয়েসের প্রেমিকা অবশ্য নেহাৎ কোনো বাস্তব নারীও নয়, সে জীবন্ত বটে, তবু অনেকখানি কল্পনা দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করে নিতে হয়। যার কল্পনাশক্তি নেই, তার জীবনে প্রেমও নেই। প্রেমের নামে অন্য কিছু সে বোধ করে, দুধের বদলে পিটুলি গোলা। প্রথম প্রেমের যৌন বাসনাও খুব তীব্র।

প্রেমিকাকে যখন-তখন ছুঁতে ইচ্ছে করে। শুধু ছোঁয়াতেও তৃপ্তি হয় না, প্রাণ চায় তাকে একেবারে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। তার পোশাকহীন শরীরটা দেখতে ইচ্ছে করে। সামাজিক বিধিনিষেধ কিংবা লজ্জা এসব ইচ্ছেকে বাধা দেয়। সেই বাধায় আকর্ষণ আরও প্রবল হয়। সর্বক্ষণ একটা অতৃপ্তি লকলক করে বুকের মধ্যে। এই অতৃপ্তি মানুষকে ছুটিয়ে মারে, তাকে সৃষ্টিশীল করে। প্রেমিকার কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্য পুরুষরা কী না করতে পারে।

সদ্য যুবকরা পাহাড় জয় করে। সমুদ্র পাড়ি দেয়, বিজ্ঞানী হয়, কাব্য-সাহিত্য রচনা করে উন্মত্তের মতন। যে প্রেমিকার রুচি যত উন্নত, তার প্রেমিক সেই রুচির সমকক্ষ হতে চেষ্টা করবেই। প্রথম যে কিশোরীর সঙ্গে আমার প্রণয় হয়, সে কবিতা পড়তে খুব ভালোবাসতো, একেবারে কবিতা পাগল ছিল যাকে বলে। তাকে খুশি করার জন্যই আমি বেপরোয়া হয়ে কবিতা রচনার চেষ্টা করি, তার আগে কবি বা লেখক হবার কোনো ইচ্ছেই ছিল না আমার। পৃথিবীর প্রায় সব সৃষ্টিশীল কাজে প্রেমই প্রেরণা।

প্রেমের সঙ্গে যৌনতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, আবার মানুষই পারে, শারীরিক যৌনতাকে একেবারে বাদ দিয়ে শুধু প্রেমে মগ্ন হয়ে থাকতে।

এখানেই তো মানুষ ছাড়িয়ে যায় পশুজগৎকে। সকলে পারে না, কেউ পারে। রোমান্টিক প্রেম শুধু মানুষের পক্ষেই সম্ভব। দান্তে বিয়াত্রিচেকে শুধু মাত্র চোখের দেখা দেখেছিলেন মাত্র কয়েকবার। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশের ক্রবাদুর কবিরা রচনা করলেন রোমান্টিক প্রেমের গান, যার মধ্যে শারীরিক মিলনের কথা নেই। তার অনেক পরে, আমাদের দেশে চণ্ডীদাস লিখলেন রজকিনী প্রেমের কথা, যা, 'নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়'। অনেক সময় প্রেমিকা জানতেও পারে না যে তার এক গভীর প্রেমিক দূর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, কোনো দিন সে কাছে এসে মনের কথাও বলবে না। ব্যর্থ প্রেমের একটা মহিমা আছে। দুনিয়ার সমস্ত কাব্য-সাহিত্যে ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকাদেরই জয়জয়কার। সার্থক প্রেম নিয়ে কদাচিৎ সার্থক সাহিত্য রচিত হয়েছে।

প্রেম আর ভালোবাসা, এই দুটি আলাদা শব্দ দিয়ে অনেক সময় একই সম্পর্ককে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু নারী ও পুরুষের ভালোবাসা আর গাছপালা, জীব-জন্তুর প্রতি ভালবাসা কখনো এক হতে পারে? অথচ আমরা আলগা ভাবে সব ক্ষেত্রেই ভালোবাসা শব্দটি ব্যবহার করি। ইংরিজি লাভ শব্দটির মতন। কিন্তু ইংরেজিতে ওই লাভ একটাই শব্দ, আমাদের ভালোবাসার পাশে রয়েছে প্রেম, যার দ্যোতনা খানিকটা আলাদা। অবশ্য ইংরেজিতে লাভ মেকিং বলতে যা বোঝায়, আমাদের বাংলায় তার কোনো প্রতিশব্দ নেই। জীবে প্রেম, প্রকৃতি প্রেম, প্রেম ধর্ম এসবই এককালে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু এখন প্রেম অনেক ঘনিষ্ঠ ও গভীর অর্থে বোঝায়। একজন নারী পুরুষের মধ্যকার যৌনতার সম্ভাবনাময় আকর্ষণ ( সফল বা বিফল চেষ্টাহীন যাই হোক ) সম্পর্ক। সাধু বাংলায় ভাতৃপ্রেম বলা হতো বটে, কিন্তু চলিত বাংলায় ভাই বোনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বলাটা অকল্পনীয়। সন্তানের সঙ্গেও বাবা-মা'র ভালোবাসার সম্পর্ক।

প্রেমের নয়। ক্রমশই প্রেম শব্দটিতে বিশিষ্টতা এসেছে। একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে সেই টান, যা ব্যাখ্যার অতীত। কোন নারী ও কোন পুরুষের মধ্যে এই টান দেখা দেবে, তা যেন খানিকটা দৈবের

ব্যাপার। অনেক লোকের ভিড়ে রয়েছে সেই দু'জন, তাদের দৃষ্টির যে অদৃশ্য সেতুবন্ধন, তা আর কেউ বুঝছে না। রূপ, বিত্ত, বংশগরিমা এই প্রেমের কাছে তুচ্ছ। এই প্রেমের যেমন আনন্দ, তেমনই দাহ। এই দাহ যে কত সাংঘাতিক হতে পারে, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম এক বন্ধুর আকস্মিক উক্তি শুনে। বন্ধুটি খুবই সার্থক হয়েছে, নিজস্ব ব্যবসা, প্রকাণ্ড বাড়ি, কয়েকখানা গাড়ি, সুন্দরী স্ত্রী, ফুটফুটে দুটি সন্তান। যখন-তখন বিদেশে যায়। একদিন এক হোটেলে বসে খানিকটা নেশার ঝোঁকে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল, তোর রোশনিকে মনে আছে? জানিস কোথায় আছে সে? আমি দু'দিকে ঘাড় নেড়েছিলাম। রোশনি আমাদের কলেজ-জীবনের এক বান্ধবী, বহুদিন তার খোঁজ রাখি না, কোথায় থাকে তাও জানি না। বন্ধুটি ভাঙা গলায় বলেছিল, দ্যাখ, আমার যা টাকা আছে, এক্ষুনি এই হোটেলটা কিনতে পারি, অনেক সুন্দরী মেয়েকে বিছানায় ডাকতে পারি, যা ইচ্ছে করে সবই পেতে পারি। কিন্তু এসবে কী হয়?

সেই রোশনি হারামজাদী আমার বুকটা মুচড়ে দিয়ে গেছে। সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাই এখনো কোনো কিছুতেই ঠিক স্বস্তি পাই না।

প্রথম প্রেমের শিহরণ আসে বারো-তের বছর বয়েসে। আর চলে যায় কবে? ঠিক জানি না, কেউ সে কথা লিখেও যায়নি। বুক থেকে প্রেম চলে গেলে আর বেঁচে থেকে লাভ কী? সে রকম অবস্থা এলে আমি ঠিক আত্মহত্যা করবো!

# আমার পছন্দের দশজন বঙ্গললনা

## রানী রাসমণি

রানী রাসমণি আসলে রানী ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক দরিদ্রের ঘরের অসাধারন সুন্দরী মেয়ে, তাঁর বাবা ছিলেন নদীয়ার একজন কৃষি-জীবী। তাঁর যখন এগারো বছর বয়েস, একদিন অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে স্নান করছিলেন গঙ্গায়, সেই সময় কলকাতার এক ধনী যুবক নদীপথে বজরা ভ্রমণে যেতে যেতে ঐ বালিকার রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন। ঠিক রূপকথার গল্পের মতন, সেই গরিবের মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হলো কলকাতার বিরাট ধনী প্রীতিরাম মাড়ের ছেলে রাজচন্দ্রের সঙ্গে। রূপ-কথার গল্প এইখানে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু রাসমণির জীবন এখান থেকেই শুরু হলো।

স্বামীগৃহে এসে রাসমণি লেখাপড়া শিখতে শুরু করলেন। জমিদারি পরিচালনার ব্যাপারে স্বামীকে পরামর্শ দিতেন। ১৮৩৬ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হলো। তখনকার দিনে বিধবার সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের ছিনিমিনি খেলাই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু রাসমণি শক্ত হাতে হাল ধরলেন। শুধু তাই নয়, সম্পত্তি বাড়িয়ে ফেললেন বহুগুণ।

তখন এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন। রাসমণি ইংরেজদের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে পাল্লা দিতে একটুও ভয় পাননি। দুটি ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁর বাড়িতে দুর্গোৎসবের সময় প্রবল ঢাক-ঢোল বাজতো, এতে ইংরেজরা আপত্তি জানায়। এর উত্তরে রানী তাঁর নিজস্ব এলাক ঘিরে দিয়ে বললেন, সেখানে কোনো সাহেব ঢুকতে পারবে না। সেই এলাকাটিই বর্তমান চৌরঙ্গি-ধর্মতলা অঞ্চল। আর একবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঙ্গায় গরিব জেলেদের মাছ ধরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। রাসমণি বহু টাকা দিয়ে গঙ্গার একটি অংশ ইজারা নিলেন

এবং হুকুম দিলেন, সেখানে জেলেরা ইচ্ছেমতন মাছ ধরতে পারবে কিন্তু কোম্পানির কোনো জাহাজ ঢুকতে পারবে না সেখানে। এই দুটি ক্ষেত্রেই ইংরেজদের ক্ষমা চাইতে হয়েছিল।

সেই সময় দলে দলে ছেলেরা ক্রিশ্চান হচ্ছে এবং শিক্ষিতরা সবাই হিন্দুধর্মের নিন্দায় মুখর। হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য রাসমণি গঙ্গার ধারে বিশাল এক মন্দির নির্মাণ করলেন। কিন্তু তিনি উচ্চবর্ণের হিন্দু ছিলেন না বলে কোনো ব্রাহ্মণ তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পুরেহিতের কাজ করতে রাজী হলেন না। হিন্দুধর্মের তখন এমনই ক্ষয়িষ্ণু দশা। তেজস্বিনী রাসমণি সারা ভারতবর্ষে লোক পাঠিয়েছিলেন পুরোহিত খোঁজার জন্য। শেষ পর্যন্ত হুগলী জেলার দুই তরুণ ব্রাহ্মণ ভ্রাতা এই মন্দিরে পুজো করতে রাজী হয়। ছোট ভাইটির নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এই গদাধরই পরে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে বিশ্ববিখ্যাত হন।

দেশের সাধারণ মানুষই রাসমণিকে রানীর মর্যাদা দিয়েছিল।

## কাদম্বরী দেবী

এই মহিলা একই সঙ্গে দু'জন বিখ্যাত কবিকে প্রেরণা দিয়েছিলেন।

ইনিও সাধারণ পরিবার থেকে এসেছিলেন কলকাতার সংস্কৃতি জগতের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং ধনাঢ্য ঠাকুরবাড়ির বধূ হয়ে। এঁর স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন বিদগ্ধ গুণী শিল্পী। তিনি সফল নাট্যকার, বহু বিখ্যাত গানের সুরকার এবং সার্থক অনুবাদক। উত্তম সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষা জানতেন। এর বন্ধু, তখনকার দিনের বিখ্যাত কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। ঠাকুরবাড়িতে তাঁদের নিজস্ব অংশে একটি চমৎকার বারান্দা মনের মতন করে সাজিয়েছিলেন কাদম্বরী, সেখানে বসতো তাঁর স্বামীর বন্ধুদের কবিতার আসর। এই আসরের এক কোণে এসে বসতেন কাদম্বরীর প্রিয় লাজুক কনিষ্ঠ দেওর রবীন্দ্রনাথ।

বিহারীলাল কাদম্বরীকে তাঁর 'সাধের আসন' নামে কবিতার বই উৎসর্গ করেন। বিহারীলালকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুরু বলে মেনেছিলেন।

কিন্তু গুরুর প্রতি তাঁর বৌদিটির আকর্ষণ দেখে কি রবীন্দ্রনাথের মনে ঈর্ষা জেগেছিল ? কাদম্বরীও কৌতুক করে প্রায়ই তাঁর এই দেওরকে বলতেন, পারবে বিহারীলালের মতন কবিতা লিখতে ?

তিনিই জাগিয়ে দিয়েছিলেন তরুণ কবির মনে স্পর্ধা, এর ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুরুকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন অনেক দূর।

রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হবার কিছুদিনের মধ্যেই কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন। অবশ্য শেষের দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীর প্রতি কিছুটা অবহেলা দেখাতেন, মাঝে মাঝে রাত্রে বাড়ি ফিরতেন না। এটাও তাঁর আত্মহত্যার একটা কারণ হতে পারে। যারা যৌবন বয়সে মারা যায়, তাদের আর বয়েস বাড়ে না। কাদম্বরী চিরকালই এক অপূর্ব রূপসী যুবতী রয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ঠিক কতদূর পৌঁছেছিল তা নিয়ে বিতর্ক আজও থামেনি। তবে রবীন্দ্রনাথের বহু বিশ্ববিখ্যাত রচনার তিনিই মূল প্রেরণাদাত্রী। শেষ জীবন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বৌদিকে ভুলতে পারেননি। বিভিন্ন ইঙ্গিতপূর্ণ নামে রবীন্দ্রনাথ অন্তত সাতখানা বই উৎসর্গ করেছেন কাদম্বরী দেবীকে। তার মধ্যে একটিতে রবীন্দ্রনাথ এঁর সঙ্গে তুলনা করেছেন গ্রীক পুরাণের জাদুবিদ্যার দেবী Hecate-এর সঙ্গে।

## বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ

যে সময় মুসলমান পরিবারের মেয়েরা বোরখার আড়ালে মুখ ঢেকে রাখতে বাধ্য হতেন, সেই সময় বেগম রোকেয়া নারীমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। শুধু স্বপ্নই দেখেননি, কাজেও পরিণত করেছিলেন অনেকখানি।

রংপুর জেলার এক গ্রামের রক্ষণশীল পরিবারে রোকেয়ার জন্ম। কঠোর পর্দাপ্রথার মধ্যে বর্ধিত হয়েছেন, লেখাপড়া শিখতে দেওয়া হয়নি। তবু তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরিজি-বাংলা পড়তে শিখলেন।

যথারীত ষোল বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হলো সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে। স্বামীর ঘর করতে তিনি চলে এলেন বিহারে। সাখাওয়াৎ হোসেন উদারমনস্ক পুরুষ ছিলেন। তিনি স্ত্রীর শিক্ষার সুযোগ করে দিলেন, প্রতি মাসে কিনে দিতেন প্রচুর বই। স্ত্রীকে তিনি প্রবন্ধ ও গল্প লেখার উৎসাহও দিতেন।

স্বামীর কাছে ভালো ব্যবহার পেলেও, সমগ্রভাবে মেয়েদের প্রতি পুরুষ জাতির যে আধিপত্য ও অত্যাচার, তা তাঁকে সর্বক্ষণ কাঁটার মতন বিঁধতো। তাঁর অনেক লেখায় ফুটে উঠেছে এই বিষয়টি। ভাগলপুরে থাকার সময় তিনি ইংরিজিতে লিখে ফেললেন একটি উপন্যাস, তার নাম Sultana's Dream। তার বিষয়বস্তু বেশ মজার। এক সুলতান স্বপ্ন দেখছেন যে পৃথিবীতে নারী-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীরাই দেশের শাসন ও সমাজব্যবস্থা চালায়। পৃথিবীতে এসেছে অবিমিশ্র সুখ ও শান্তি, যুদ্ধ একেবারে বন্ধ, রোগভোগ হয় না, এমন কি মশারাও কামড়ায় না। পুরুষ জাতি সবাই শৃঙ্খলিত, তাই চুরি-ডাকাতি-খুন একেবারেই ঘটে না।

রোকেয়ার স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি ঐ উপন্যাসের খসড়াটি পড়ে হেসে বললেন, 'A terrible revenge !' রচনাটির ইংরিজি সংশোধন করার জন্য তিনি সেটি পাঠিয়ে দিলেন কমিশনার ম্যাকফারলেন সাহেবের কাছে। সেই সাহেব একটুও কাটাকুটি না করে লেখাটি ফেরত দিয়ে লিখলেন, "The ideas expressed in it are quite delightful and full of originality and they are written in perfect English."

রোকেয়ার বিবাহিত জীবন মাত্র দশ বছরের। তারপর রোকেয়া মন দিলেন সাহিত্য রচনায় এবং সমাজসেবায়। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য তিনি একটি স্কুল খুললেন ভাগলপুরে। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো, স্কুলটি চালানো গেল না। রোকেয়া তাতে একটুও দমে না গিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের। সেই স্কুল সগৌরবে

আজও চলছে। বাকি জীবনটা রোকেয়া আরও নানারকম নারী-সেবামূলক কাজ করে গেছেন।

## প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার

আধুনিককালে ভারতবর্ষের অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় বাঙালী মেয়েরা দুটি ব্যাপারে প্রথম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। তারাই আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করেছে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে। ভারতের প্রথম দু'জন মহিলা গ্রাজুয়েটই বাঙালী। তিরিশের দশকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত অনেক বাঙালী মহিলাই স্বাধীনতার আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। প্রীতিলতা তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতম।

প্রীতিলতা চট্টগ্রামের মেয়ে, ছাত্রী হিসেবে ছিলেন দুর্দান্ত। আই. এ. পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে প্রথম হয়েছিলেন। বি. এ. পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিস্টিংকশান পান। সেই সঙ্গে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন অল্প বয়েস থেকেই। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা সূর্য সেনের আত্মগোপনের সময়ে বিশেষ সাহায্য-কারিণী ছিলেন প্রীতিলতা। একবার এক গ্রামের বাড়িতে সূর্য সেন ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে প্রীতিলতা যখন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করছেন, তখন মিলিটারী হঠাৎ সেই বাড়ি ঘিরে ফেলে। দুই পক্ষেই গুলি চলে, বিপ্লবীদের গুলিতে মারা যায় ক্যাপ্টেন ক্যামেরন। সূর্য সেন ও প্রীতিলতা তারই মধ্য দিয়ে পালিয়ে যান।

প্রীতিলতার গ্রেফতারের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল, তবু দুঃসাহসিনী প্রীতিলতা কয়েকজন সঙ্গী ও বোমা-পিস্তল নিয়ে এক রাত্তিরে পাহাড়তলী ইওরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। ইওরোপিয়ানদের ভয় পাইয়ে দেওয়া ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। খানিকক্ষণ গোলাগুলি চালনার পর দলের অন্য সবাই নিরাপদে পালিয়ে গেল কিন্তু প্রীতিলতা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে, পটাসিয়াম সায়োনাইড খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। কেন তিনি সেদিন আত্মহত্যা করেছিলেন, তা আজও সঠিকভাবে জানা

যায়নি। কিন্তু প্রীতিলতার দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে বহু মেয়েকে প্রেরণা দিয়েছে।

## কানন দেবী

কিছুদিন আগে আমি কানন দেবীকে একটি সভায় বক্তৃতা করতে শুনেছি। কী সুন্দরভাবে গুছিয়ে চমৎকার রসিকতা মিশিয়ে তিনি বলতে পারেন। অথচ এই কানন দেবী মাত্র বারো-তের বছর বয়েসে, প্রায় অশিক্ষিত অবস্থায় ফিল্মের জগতে এসে পড়েন হঠাৎ, তাঁর কোনো উল্লেখ-যোগ্য বংশপরিচয়ও ছিল না। তারপর তিনি নাচ শিখেছেন, গান শিখেছেন, ইংরিজি বলতে শিখেছেন। তখন তাঁর নাম ছিল কাননবালা। সেলফ মেড ম্যান কথাটা প্রায়ই শোনা যায়। কানন দেবী সার্থক-ভাবে একজন সেলফ মেড লেডি। কয়েক দশক ধরে তিনি ছিলেন বাংলা ফিল্মের একচ্ছত্র নায়িকা, অনেক হিন্দী ফিল্মেও তিনি সার্থক-ভাবে অভিনয় করেছেন, একসময় তাঁর গান লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। বয়েস হবার পরেও তিনি রূপালি পর্দা আঁকড়ে থাকেননি, সম্মানের সঙ্গে সরে গেছেন অন্তরালে।

মনে আছে, পঞ্চাশের দশকে আমি একবার একটা গ্রামের মাঠে ভ্রাম্যমান সিনেমা দেখেছিলাম। যে ছবিটি দেখানো হচ্ছিল, তাতে কানন দেবী ছিলেন না। নতুন নায়িকা সুচিত্রা সেন যখন পর্দায় এলেন, অমনি কিছু লোক চেঁচিয়ে উঠলেন, কাননবালা! কাননবালা!

সমস্ত ভালো অভিনেত্রীদেরই একসময় সাধারণ মানুষ মনে করতো কানন দেবী!

এর পর আমি যাঁদের কথা লিখছি, সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁরা সকলেই এখনো বেঁচে আছেন।

## আশাপূর্ণা দেবী

আশাপূর্ণা জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। সারা ভারতবর্ষে প্রথম সারির কয়েকজন লেখক-লেখিকার মধ্যে তাঁর স্থান। অথচ এই আশাপূর্ণা কোনোদিন স্কুলে যাননি, স্বাধীনভাবে কখনো একা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করেননি। বাচ্চা বয়সে তাঁর দাদারা যখন লেখাপড়া শিখতেন, আশাপূর্ণা তাঁদের পাশে বসে শুনতেন। এইভাবে তাঁর অক্ষর জ্ঞান, তারপর বই পড়তে শেখা, রামায়ণ-মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ তিনি পাঠ করেছেন নিজের চেষ্টায়।

অল্পবয়সে তাঁর বিয়ে হলো, এক সময় তিনি মা হলেন, কালক্রমে দিদিমা ও ঠাকুমাও হলেন। পুরোপুরি একজন সংসারী মহিলা, সকলের প্রতি তাঁর সমান স্নেহ ও মনোযোগ, সাংসারিক দায়িত্বে কোনো ত্রুটি নেই। এরই মধ্যে তিনি লিখতে শুরু করলেন, প্রথম প্রথম সেইসব লেখা বিশেষ কেউ গ্রাহ্য করেনি, কিন্তু নিজের প্রতিভার জোরে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিলেন, তারপর সর্বভারতে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, সারাজীবনই যিনি বাড়ির মধ্যে কাটালেন, বাইরের পৃথিবীর কথা তিনি এত জানলেন কী করে? অসাধারণ তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি। এবং আশি বছর বয়সেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আধুনিক।

ভারতের সব ভাষায় তাঁর বই অনুবাদ হয়েছে, তাঁর বহু কাহিনী বোম্বাই-মাদ্রাজে ফিল্ম হয়েছে। অসম্ভব তাঁর জনপ্রিয়তা, কিন্তু তাঁর ব্যবহারে সামান্যতম অহঙ্কার কেউ কখনো দেখেনি। তাঁর ব্যবহার সব সময়ই স্নেহময় ও মধুর। তাঁর কাছে কখনো গেলেই মন ভালো হয়ে যায়।

## দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশে এখনো মেয়েরা সাইকেল চালিয়ে গেলে অনেকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখে। মেয়েরা গাড়ি চালালে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা কটু মন্তব্য করে। তা হলেও মেয়েদের প্লেন চালানো এমন কিছু নতুন ব্যাপার

নয়। কিন্তু দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পাইলট হয়েছিলেন এবং প্লেন চালানোটাকেই জীবিকা হিসেবে নিতে চেয়েছিলেন, তখন আর কোনো বাঙালী মেয়ে এরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বপ্নেও স্থান দেয়নি।

সম্প্রতি এয়ার বাসের পাইলট হিসেবে তিনি অবসর নিয়েছেন। পৃথিবীতে আর কোনো মহিলাই কমার্শিয়াল ফ্লাইটে এয়ার বাস চালাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। কোনো একটা ব্যাপারে শুধু প্রথম হওয়াই বড় কথা নয়, কিন্তু দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় এটাই প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবীর কোনো জীবিকাই পুরুষদের একচেটিয়া হতে পারে না, মেয়েরাও সমানভাবে যোগ্যতা দেখাতে পারে।

দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, শুনেছি তাঁর ব্যক্তিত্ব খুব আকর্ষণীয়।

## সুচিত্রা মিত্র

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা ফিরোজা বেগমের গানের আমি খুবই ভক্ত, কিন্তু সুচিত্রা মিত্র শুধু একজন প্রতিভাময়ী গায়িকাই নন, তারও অতিরিক্ত কিছু। এখন তাঁর বয়েস সম্ভবত ষাটের কাছাকাছি কিন্তু আজও তিনি যৌবনের প্রতিমূর্তি। পারস্যের ছুরির মতন ঝকঝকে তাঁর ব্যক্তিত্ব। গানের মধ্যে মগ্ন হয়ে গিয়ে তিনি আমাদের মতন বেসুরো মানুষের মনেও সুরের সঞ্চার ঘটিয়ে দিতে পারেন। আবার ঘরোয়া আলাপ-আলোচনায়, গল্পে, হাসি-ঠাট্টায় তিনি সব সময় অতি প্রাণবন্ত। অল্পবয়সে দেখেছি, তিনি মাঠে-ঘাটে, জনসভায়, যে-কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে খালি গলায় কিংবা হাতে একটা মাইক নিয়ে গান করছেন। অন্যান্য গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে তাঁর আর একটা তফাত, তিনি কক্ষণো বই দেখে গান করেন না।

সুচিত্রা মিত্রের গলায় আছে ক্লাসিকাল মেজাজ। তিনি অনায়াসেই খেয়াল-ঠুংরি গাইতে পারতেন মনে হয়, কিন্তু তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতকেই প্রিয় করে রাখলেন সারাজীবন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র

সুচিত্রা মিত্রকেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে ডাকা হয়।

গান ছাড়াও তিনি ছবি আঁকতে পারেন, ছড়া লিখতে পারেন, অভিনয় ও আবৃত্তি করতে পারেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে অনেক অশান্তি সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু সুচিত্রা মিত্রের মুখে তার কোনো প্রতিফলন নেই। তাঁর গান আমাদেরও অনেক দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।

## বেগম হাসিনা

ইনি শেখ মুজিবরের কন্যা এবং বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দলগোষ্ঠীর নেত্রী। এখন পর্যন্ত এটাই তাঁর পরিচয়। সেরকম উল্লেখযোগ্য কোনো কীর্তি স্থাপন করতে পারেননি। কিন্তু এই মহিলা অনেক বেদনা, অনেক বিপদ পার হয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সময় তিনি সামরিক বাহিনীর পাহারায় গৃহবন্দিনী ছিলেন, যে কোনো সময়ে তাঁর প্রাণ যেতে পারতো। কিন্তু সাংঘাতিক এঁর মনের জোর, বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুস্থতা ফিরিয়ে আনার জন্য ইনি বদ্ধপরিকর।

বেগম হাসিনার সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে. এই মহিলার মধ্যে কিন্তু অসাধারণ গুণ আছে। তাঁর ব্যবহার অতি স্বাভাবিক, তাঁর হাসিতে ফুটে ওঠে মধুর সারল্য। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁর চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা। রাজনৈতিক নেতাদের মতন তাঁর কথার মধ্যে প্যাঁচ নেই কিন্তু দেশের মানুষের অবস্থা সম্পর্কে তিনি পরিপূর্ণ সজাগ। আমার ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে এই মহিলা বাঙালীর জীবনে খুব বড় একটা ভূমিকা নেবেন। অতীত চারণার চেয়েও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমার আগ্রহ বেশি।

## অপর্ণা সেন

সত্যজিৎ রায়ের 'তিন কন্যা' ফিল্মে একটি দুরন্ত কিশোরীর ভূমিকায় আমরা অপর্ণাকে প্রথম দেখি। তখন তাঁর নাম ছিল অপর্ণা দাশগুপ্ত।

তখনই বোঝা গিয়েছিল, এই মেয়েটি জাত অভিনেত্রী।

অপর্ণা যতই বড় হতে লাগলেন, বাংলা ফিল্মের দুর্দশা ততই ঘনিয়ে আসতে লাগলো। অপর্ণার মতন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীকে ব্যবহার করার মতন ভালো বাংলা ছবি কটা হয়? অপর্ণা জেদ করে বম্বেতে হিন্দী সিনেমার জগতে গেলেন না, সেখানে গেলে তিনি শাবানা আজমী, স্মিতা পাতিলের সমকক্ষ হতে পারতেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু বাংলাকে ভালোবেসে তিনি এখানেই রয়ে গেলেন। ক্রমশ নিম্ন মানের ফিল্মে অর্থহীন ভূমিকায় তিনি নামতে বাধ্য হলেন। এইভাবে ক্রমশ হারিয়ে যাওয়াই হয়তো তাঁর নিয়তি হল। কিন্তু অপর্ণার প্রতিভার সঙ্গে মিশে আছে অসম্ভব তেজ এবং আত্মসম্মানবোধ। কলকাতায় আর বিশেষ ভালো ফিল্ম তোলা হচ্ছে না, অপর্ণা নিজেই ভালো ফিল্ম তৈরি করার উদ্যোগ নিলেন। তাঁর 'থার্টিসিক্স চৌরঙ্গী লেন' এবং 'পরমা'য় রয়েছে বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের সঙ্গে দুঃসাহস। তিনি শুধু পরিচালনায় স্বার্থক নন, নিজেই কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। বাংলায় তো আর কেউ নেই-ই, সারা পৃথিবীতেই বা এরকম মহিলা ফিল্ম মেকার কজন? এর মাঝখানে কিছুদিন মঞ্চে অভিনয় করেও অপর্ণা দেখিয়েছিলেন তাঁর ক্ষমতা। এবং পত্রিকা সম্পাদনা করতে এলেন। সাধারণত চিত্রতারকারা এই সব ক্ষেত্রে শুধু নাম ধার দেয়, কিন্তু আমরা জানি, 'সানন্দা'র সম্পাদিকা হিসেবে অপর্ণা শুধু যে প্রত্যেকটি সংখ্যার পরিকল্পনা করেন তাই-ই নয়, তিনি প্রেসের কাজ লে আউট ইত্যাদিও শিখে নিয়েছেন। অপর্ণা ইংরিজিতে কবিতা অনুবাদ করতে পারেন, চমৎকার আবৃত্তি করেন, বহুমুখী তাঁর প্রতিভা।

অপর্ণার মুখের দিকে তাকালে এখনো যেন 'তিন কন্যা'র সেই কিশোরী মেয়েটিকে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর জীবনীশক্তি মুগ্ধ হয়ে দেখার মতন। আমার ধারণা, অপর্ণা ভবিষ্যতে আমাদের আরও অনেক রকম চমক দেবেন!

—